নেপোলিয়নের জীবনে নারী

মদনমোহন গুহ



শ্রুতি প্রকাশনী
৩/১এ জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ :
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ বুদ্ধ পূর্ণিমা
২৩শে মে, '৫৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
শ্রীমদন সরকার

শ্রুতি প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীঅলোক মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে শ্রীযুগলকিশোর রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাঁধাই—বাইণ্ডিং কনসার্ণ ৩/১এ জয়নারায়ণচন্দ্র লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার বাবা

স্বর্গীয় হেমাঙ্গভূষণ গুহ

ও

মা স্বর্গীয়া সুরজাবালা গুহ

এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে—

লেখক

ভূমিকা

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের বিশেষ কিছু দিক নিয়ে প্রবন্ধাকারে এই পুস্তকটি লেখা হল। এখানে নেপোলিয়নের সাথে তাঁর স্ত্রী 'যোসেফাইন' ও 'মেরিয়া লুইসার' সম্পর্কের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়াস চালিয়েছি। বলার চেষ্টা করেছি তাঁর সাথে মেরিয়া ওয়ালাস্কার (যাঁকে তাঁর পোলিশ স্ত্রী বলা হতো) ও আরও কয়েকজন নারীর সম্পর্কের কথা। এখানে নেপোলিয়নের যুদ্ধবিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে বন্দী অবস্থায় তাঁর শেষ জীবনের করুণ কাহিনী ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

পাঠকবর্গের দ্বারা এ লেখা সমাদৃত হলে বুঝবো আমার এই প্রয়াস সফল হয়েছে। **এই পুস্তকে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ পরিদৃষ্ট হওয়ায় তার একটি সংশোধনী** দেওয়া হল। পাঠকসাধারণের কাছে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এতদ্‌সত্ত্বেও আরও কিছু ভ্রমপ্রমাদ যদি পাঠকবর্গের গোচরে আসে তৎসংশোধনেও তাঁরা যেন আমায় সহায়তা করেন। নিবেদনমিতি—

লেখক

উপাদান সংগ্রহ

লাইফ অব নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—জে. এস. সি. এবট
নেপোলিয়ন—এমিল লুডউগ
নেপোলিয়ন—ভিনসেণ্ট ক্রোনিন
এ সর্ট হিষ্ট্রি অব নেপোলিয়ন—জন রবার্ট শীলে
দি নিক্ষো অ্যাণ্ড আদার ম্যানিয়েকস—আরভিং ওয়ালেস
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—দীনেন্দ্রকুমার রায়
কবিগুরু গ্যেটে—কাজী আব্দুল ওদুদ
দি ফ্র্যান্স রিভ্যুলিয়শন—টমাস কার্লাইল
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—সুকন্যা
বার্কস রিফ্লেকশনস অন দি রিভ্যুলিয়শন অব ফ্রান্স
দি নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড এন্‌সাইক্লোপেডিয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক দেশপ্রিয় বসু
ডঃ হেনা বসু
শ্রীদেবীপ্রসাদ দাশগুপ্ত
শ্রীঅশোক রায়
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভড়
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ও তার কর্মীবৃন্দ
শ্রীমতী আনন্দময়ী দাশগুপ্তা (গ্রন্থাগারিক)
শ্রীগৌরমোহন চ্যাটার্জী (সহ গ্রন্থাগারিক)
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার দত্ত (প্রাক্তন কর্মী)
শ্রীঅজিতকুমার পাত্র (কর্মী)
মহঃ আব্দুল গফুর (কর্মী)

—মদনমোহন গুহ

যোসেফাইন ও নেপোলিয়ন

অসাধারণ-শক্তিধর ফরাসী সম্রাট-নেপোলিয়নের জীবনে যোসেফাইন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। ইতিহাসের পাতায় নেপোলিয়নের সাথে যোসেফাইনের নাম ও চিরকাল বিধৃত হয়ে থাকবে।

নেপোলিয়নের জন্ম ইতালীর অন্তর্গত কর্সিকাদ্বীপে। নেপোলিয়নের জন্মের দুমাস আগে এ দ্বীপ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। নেপোলিয়নের পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী। নাম কার্লো বোনাপার্ট। তিনি ছিলেন সুদর্শন। তাঁর পুরুষাগুণ চেহারা ও ব্যক্তিত্ব যে কোন ব্যক্তিকে সহজেয় আকর্ষণ করত।

এক সময়ে এ বোনাপার্ট পরিবার ছিল আর্থিক সম্পদে সমৃদ্ধ। বোনাপার্ট পরিবারের আসল বাসস্থান ছিল ইতালীর অন্তর্গত টাস্কানী প্রদেশে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই পরিবারের একটি শাখা কর্সিকার আজাকসিও শহরে এসে বসবাস শুরু করেন।

নেপোলিয়নের পিতার জন্ম ১৭৪৬ সালে। তিনি ইতালীর পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট-ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮বৎসর বয়সে তিনি লোটিজিয়া রামোলিনি নাম্নী পনের বৎসরের এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন।

কার্লো বোনাপার্টের মানসিক দৃঢ়তা ছিল অপরিসীম। সে মানসিক শক্তির জোরে কার্লো অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কর্সিকার একজন শ্রেষ্ঠ-আইনজীবীরূপে পরিগণিত হন।

নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়া রামোলিনি (বোনাপার্ট) বিশ্ব-ইতিহাসে একটি-স্মরণীয় নাম। যাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়নের অবির্ভাবকালে সমগ্র ইয়োরোপ মধ্যযুগের নৃশংস রাজাদের বংশধরদের দ্বারাই শাসিত হত। ফ্রান্স ছিল বুরবোঁ সম্রাটের

অধীনে। মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় রাজদণ্ডের ধারক ও বাহক ছিল এমন সব সামরিক অধিনায়ক যাঁরা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করতে চাইত না। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ইয়োরোপের দুর্বল মানুষ ও রাষ্ট্রের ওপরে মধ্যযুগের এ সমস্ত সামরিক শাসন কর্তাদের অপজাত বংশধরগণ যে অত্যাচার চালাচ্ছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

নেপোলিয়নই এ যুগের অবসান ঘটিয়ে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণীতে সমগ্র ইয়োরোপ তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

নেপোলিয়নের এরকম মানসিক দৃঢ়তার মূলে রয়েছে তাঁর মা লেটিজিয়ার অসামান্য অবদান। তাঁরই শিক্ষাগুণে নেপোলিয়নের চরিত্র মহিমাময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়ন তাঁর মার কথা প্রতি মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন।

কুমারী লেটিজিয়া রামোলিনি ছিলেন কর্সিকার অধিবাসিনী। তাঁর পিতা ছিলেন আজাকসিও সৈন্যবিভাগের একজন অধিনায়ক। পরে তিনি আজাকসিও শহরের রাস্তা ও সেতু ইত্যাদি পরিদর্শকের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পান।

সাতবৎসর বয়সে লেটিজিয়া তাঁর পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা ক্যাপ্টেন ফ্রাঞ্জ ফেচে নামক জেনোয়ার নৌবাহিনীতে কর্মরত একজন সুইস্ অফিসারকে বিয়ে করেন। তাঁর সৎপিতা তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন। এই সময় কার্লো বোনাপার্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

লের্টিজিয়া রামোলিনি ছিলেন কর্সিকার মেয়েদের আদর্শস্থানীয়া। রামোলিনি পরিবার ছিল ইতালীর লম্বার্ডির অন্তর্গত ক্যালেলটোর কাউণ্ট পরিবারের বংশধর। এ পরিবারে যিনি প্রথমে আজাকসিও শহরে এসে বসবাস শুরু করেন তিনি জেনোয়ার দোজে পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করে ইতালী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। "ভেনিসের গথিকরীতির চরম উৎকর্ষ দেখা যায় ১৩০৯

খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দ কাল জুড়ে নির্মিত দোজেস প্রাসাদে।"

নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়ার এক কাকা ছিলেন। ফরাসী সৈন্যরা যখন কর্সিকা আক্রমণ করে তিনি তখন ফরাসী সৈন্যদের সাথে স্বদেশ রক্ষার্থে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। তঁার নাম ছিল নেপোলিয়ন। তঁার নামানুসারে নেপোলিয়নের নামকরণ করা হয়। অল্প বয়সে তিনি মারা যান।

প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়ন নামটি ছিল একজন মিশরীয় শহীদের। যিনি রোমান সম্রাট (২৪৫খ্রীঃ-৩১৩খ্রী) ডায়ক্লেশিয়নের হাতে আলেক-জান্দ্রিয়া নগরে অশেষ কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন। ডায়ক্লেশিয়ন ছিলেন প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস। পরে তিনি রোমান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী সম্রাট। ৩০৫ খ্রীঃ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ৩১৩ খ্রীঃ স্পালাট্রো শহরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"Originally Nepoleon was the name of an Egyption martyr who suffered in Alexandria under Diocletion" —Nepoleon by Vincent crownin P.-17. লেটিজিয়া তাঁর পুত্রকে নেপোলিয়ন (Nepoleon) নামেই ডাকতেন। কিন্তু কর্সিকাবাসীরা নেপোলিয়নকে ডাকত নেবুলিয়ন (Nabulion) নামে।

নেপোলিয়ন তঁার মার জীবনী লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে ছিলেন। তাঁর মা লেটিজিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাঁরই লেখা থেকে পাওয়া যায়। লেটিজিয়ার কর্মকুশলতা ছিল আদর্শ পুরুষ সুলভ। তাঁর চরিত্রে একদিকে ছিল মেয়েদের সকুমারবিত্তি, অন্যদিকে দৃপ্ত মানবের পৌরুষ।

শৈশবে তাঁর কোন পরিচালক বা পরিচালিকা ছিল না। ছিল

না তাঁর কোন সদ্ উপদেষ্টা বা সদ্ গুরু। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিতা। তাঁর মধ্যে ছিল ভগবৎ প্রদত্ত ঐশ্বারিক শক্তি। এ শক্তির সাহায্যে তিনি যে কোন প্রতিকূল অবস্থার সাথে মোকাবিলা করতে পারতেন। তিনি তার কাজকর্ম এমন নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন যা কোন সাধারণ পুরুষ বা মহিলার পক্ষে কল্পনা করা যায় না। একদিকে তাঁর হৃদয় ছিল কুসুমের মত কোমল, অন্যদিকে বজ্রের মত কঠোর।

লেটিজিয়ার ১৩টি সন্তান ছিল। তাঁর মধ্যে পাঁচজন শৈশবে মারা যায়। পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে বেঁচে ছিলেন। তাঁর মধ্যে যোশেফের জন্ম ১৭৬৮ (যোশেফ প্রথমে নেপলস ও পরে স্পেনের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন), দ্বিতীয় সন্তান ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের জন্ম ১৭৬৯ সালের ১৫ই আগষ্ট। লুইসিয়েনের ১৭৭৫, এলিজার (মুরাটের পত্নী ও নেপলসের রাণী) জন্ম ১৭৭৭, ল্যুইর (হল্যাণ্ডের রাজা) জন্ম ১৭৭৮ পালিনের ১৭৮০, কেরোলিনের ১৭৮২, জেরোমের (ওয়েষ্ট ফেলিয়ার সম্রাট) ১৭৮৪।

লেটিজিয়া তাঁর সব ছেলেমেয়েদের সমান চোখে দেখতেন। প্রয়োজন বোধে সকলের ওপর সমান শাস্তিই প্রদান করতেন। ভালকাজের জন্য সকলেই তার কাছে সমভাবে সমাদর পেত। সৎ, অসৎ, ভালো, মন্দ, সকলেই তাঁর কাছে তাদের কাজের জন্য উপযুক্ত, সাজা বা পুরস্কার পেত। ক্ষয়, ক্ষতি, অভাব, অনটন বা কঠোর পরিশ্রম কোন কিছুই তাকে অবদমিত করতে পারত না। তাঁর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ছিল অপারিসীম। সবকিছু অতি সাহসের সাথে মোকাবিলা করার তাঁর এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। নেপোলিয়ন বলেছেন তাঁর মার ন্যায় এরকম সর্বগুণান্বিতা ও বিজ্ঞা মহিলা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

লেটিজিয়া স্বামীসহ কর্সিকার রাজধানী আজাকসিও শহরে সুরম্য প্রাসাদবৎ অট্টালিকায় বসবাস করতেন। শহরের এগৃহ ছাড়া রাজধানীর কয়েকক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে কর্সিকার এক নির্জন পল্লীতে ও তাঁদের একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল। পল্লীপ্রকৃতি ও সমুদ্রের অপূর্ব

শোভা লেটিজিয়া, তাঁর স্বামী কার্লো বোনাপার্ট ও ছেলেমেয়েদের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ফরাসীরা যখন কার্সিকা আক্রমণ করে তখন কার্লো বোনাপার্ট যুবকমাত্র। সবে বিয়ে করেছেন। স্বদেশের বিপদে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। লেটিজিয়া ও সমভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁর ও যে একটি ভূমিকা আছে সেটা তিনি ভাল-ভাবেই উপলব্ধি করতে লাগলেন। কার্লো ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। প্রেরণা জোগালেন ১৫ বছরের পত্নী লেটিজিয়া। কার্সিকার জেনারেল পয়োলির নেতৃত্বে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কার্লো।

এ সময়ে লেটিজিয়ার প্রথম পুত্র যোশেফের জন্ম হয়। যোশেফের জন্মের কয়েকমাসের মধ্যেই লেটিজিয়া আবার গর্ভবতী হন।

ফরাসী সৈন্যদের ক্রমাগত আক্রমণে সুন্দরী শষ্যশ্যামলা কর্সিকা মরুভূমিতে পরিণত হল। কর্সিকার জেনারেল পয়োলি ও তাঁর সৈন্যরা ফরাসী সেনাবাহিনীর হস্তে বার বার পরাজিত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল।

এই দুর্দিনে গর্ভবতী লেটিজিয়াকে ও শিশু পুত্র যোশেফকে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অশ্ব পৃষ্ঠে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ফরাসী সৈন্যদের ভয়ে আসন্ন প্রসবা লেটিজিয়ার পক্ষে ও গৃহে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি।

বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কর্সিকার বীর সৈন্যরা পয়োলি, কার্লো বোনাপার্ট ও লেটিজিয়া সহ মন্টোরেটাণ্ড নামক কর্সিকার এক সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন।

তখন নেপোলিয়ন মায়ের পেটে। কর্সিকার বীর সৈন্যরা পয়োলির নেতৃত্বে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করেও তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারল না। রূপসী কার্সিকা ফরাসীদের পদানত হতে বাধ্য হল।

নাপালিয়নের জন্মের দুমাস আগের কথা কর্সিকাতে ফরাসী পতাকা উড্ডীন হল। কর্সিকাবাসী ফ্রান্সের বুরবোঁ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হল।

১৭৬৯ সালের ১৫ই আগষ্ট। লেটিজিয়া ভয়ভীতি কাটিয়ে আজাকসিও শহরে স্বগৃহে এসে আশ্রয় নিলেন। সেদিন প্রভাতে তিনি প্রসব বেদনা অনুভব করলেন। মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্দিরে যেতে পারলেন না। গৃহে একখানি কোচের ওপরে বসে পড়লেন। কোচের ওপর পাতা ছিল একখানা সুন্দর চাদর। সে চাদরে হোমারের ইলিয়াদে বর্ণিত অ্যাকিলাস, আগমেনন, হেক্টর প্রভৃতি মহাবীরগণের চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল। সেখানেই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়নের জন্ম হয় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে।

এভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নেপোলিয়নের মা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত লেটিজিয়ার শরীরের ওপর এত ঝড় ঝঞ্ঝাট যাবার ফলে নেপোলিয়নের পূর্ণ সময় মাতৃগর্ভে থাকার সুযোগ হয়নি। পূর্ণ সময়ের পূর্বেই নেপোলিয়ন ভূমিষ্ট হন। সে জন্য শৈশবে নেপোলিয়নের শরীর ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর শরীরে পুষ্টির একান্তই অভাব ছিল।

লেটিজিয়া ও তখন শারীরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। তাই নেপোলিয়ন নিজের মাতৃস্তন্য পান করার সুযোগ খুব কমই পেয়েছিলেন। নেপোলিয়নের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল একজন কৃষক রমণী। এ কৃষক রমণীটির নাম ক্যামিলা ইলারি। এ কৃষক রমণীটি ছিল একজন নাবিকের স্ত্রী। তার নিজের দুটি সন্তান শিশুকালে মারা যায়।

নেপোলিয়ন প্রকৃতপক্ষে ক্যামিলা ইলারির বুকের দুগ্ধপান করেই বড় হয়েছিলেনন। ক্যামিলা ইলারির বুকের দুগ্ধে নেপোলিয়নের দেহ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

শৈশব থেকেই নেপোলিয়নের মনে অনুসন্ধিৎসার ভাব প্রবল ভাবে দেখা যেত। তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ। শিশুকাল থেকেই এসমস্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সব কিছু জানার তাঁর এতই আকর্ষণ ছিল যে যেটা তিনি জানা বা শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন সেটা না জানা বা না শেখা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই ছাড়তেন না। তাই তাঁকে নেপোলিয়ন না বলে সকলেই শৈশবে তাঁকে "রেবুলিয়ন" (Rebulion) বলেই ডাকত।

তাঁর অন্তঃকরণ ছিল কুসুমের মত কোমল। শৈশবে তাঁর হৃদয়ের সারল্য সকলকে মুগ্ধ করত। খেলার সাথীদের তিনি তাঁর নিজের খেলার জিনিসপত্র দিয়ে দিতেন। এবং সেগুলি ফিরিয়ে নেবার কথা তিনি চিন্তাও করতেন না। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত তাঁর মনে কোন স্বার্থপরতা ছিল না।

নেপোলিয়নের বাবা কার্লো ও মা লেটিজিয়া ছেলেদের প্রতি খুবই যত্ন নিতেন। বড় ছেলে যোশেফ ছিল অনেকটা শান্ত প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে উদ্দাম ভাব ছিল না বললেই চলে। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি ও মা-বাবা প্রচুর যত্ন নিতেন। নেপোলিয়ন শৈশবে কালো চেরি ফল খেতে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে নেপোলিয়নকে আজাকসিও শহরেই একজন ব্রহ্মচারিণীর (Nun) বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি করে দিলেন। সেখানে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ার সুযোগ পেত। বিকেলে শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আশে পাশে ভ্রমণে যেতেন। এই বিদ্যালয়ে নেপোলিয়নের সব চেয়ে অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে 'গিয়াকোমিনেট্টা' নাম্নী এক ছাত্রীর সাথে। তাঁরই সমবয়সী।

এর পর নেপোলিয়ন ভর্তি হন 'ফাদার রিকো' নামক একজন যাজকের বিদ্যালয়ে। এখানে কেবল মাত্র ছেলেরাই পড়াশুনা করত। এখানে এসে তিনি লিখতে পড়তে শেখেন। ইতালী ভাষায় ধীরে

ধীরে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকেন। এ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মাত্র ৮ বৎসর বয়সে একদিন বিদ্যালয় থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এক শষ্য পেষা করার কলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি কিভাবে কল চলে, কলে দিনে ও সপ্তাহে কত শষ্য পেষায় হয় সে সমস্ত বিষয় নানান ভাবে অঙ্ক কষে বের করেন। "শৈশব বস্তুতঃ ভাবী জীবনের মুকুরস্বরূপ।" শৈশবে নেপোলিয়নের অঙ্কের প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা যেত। ভবিষ্যতে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর গভীর পারদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোনাপার্ট পরিবার ফ্রান্সের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। নেপোলিয়নের পিতা কর্সিকাকে ফরাসীদের হাতে তুলে দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেন না। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর নেই। জেনারেল পয়োলি কিন্তু তখনো পর্যন্ত ফ্রান্সের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। ফরাসী সৈন্যদের হাতে কর্সিকাকে তুলে দিতে তিনি মোটেই চাননি। বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রথমে ইতালীতে এবং পরে ইংলণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

কর্সিকা ফ্রান্সের অধীনতা স্বীকার করার পর সেখানে ফরাসী সম্রাট কাউণ্ট মার্বো নামক একজন জেনারেলকে প্রেরণ করেন। এবং তাঁরই হাতে কার্সিকার শাসনভার অর্পণ করেন। কাউণ্ট মার্বো কার্সিকাতে এসে নেপোলিয়নের বাবা-মার সাথে পরিচিত হন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

১৭৭৯ সাল। নেপোলিয়নের বয়স তখন ১০ বৎসর। কাউণ্ট মার্বো প্রায় সময় বাড়িতে গিয়ে নেপোলিয়নের মার সাথে গল্প গুজব করতেন। ধীরে ধীরে নেপোলিয়নের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। মার্বো নেপোলিয়নের কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

মার্বো উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সুযোগ পেলে নেপোলিয়ন একদিন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীররূপে পরিগণিত হতে পারবে। মার্বো স্থির করলেন তিনি নেপোলিয়নকে ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেবেন।

নেপোলিয়নের সাহস বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌চাতুরী, অসাধারণ ধী-শক্তি মার্বোকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। মার্বো নেপোলিয়নের পিতার জন্যও প্যারিসে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। নেপোলিয়নকে ভর্তি করে দিলেন প্যারিসের সন্নিকটে ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ে।

নেপোলিয়ন মাকে ছেড়ে বিদেশে পড়াশুনার জন্য যেতে চাননি। কিন্তু তাঁকে যেতে হয়েছিল। মাকে ছেড়ে একাকী থাকতে হবে এ ভেবে নেপোলিয়ন বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের সাথে বিচ্ছেদের বেদনায় তিনি চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন।

মায়ের কাছে কার্সিকার ওপর ফরাসীদের আক্রমণের কাহিনী এবং তাঁর জন্মের পূর্বে ফরাসী সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাকে কিভাবে তাঁর বাবার সাথে অশ্বপৃষ্ঠে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—এসব শুনে নেপোলিয়ন মনে মনে ফরাসীদের ওপর রুষ্ট ছিলেন। তদুপরি ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে নেপোলিয়ন কোন সময় ভাল ব্যবহার পাননি। এমন কি এখানে অনেক শিক্ষকের কাছ থেকেও তিনি শুনেছেন কটু মন্তব্য।

সৈনিক বিদ্যালয়ে তিনি যখন ভর্তি হন তখন তাঁর ফরাসী ভাষায় জ্ঞান ছিল সীমিত। বিদ্যালয়ের বন্ধুরা তাই তাঁকে উপহাস করত। ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরায় ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। তাদের সাথে পড়াশুনা করতে গিয়ে নেপোলিয়ন নিজেকে বড়ই ছোট মনে করতেন।

তাঁর সঙ্গী সাথীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, অজস্র অর্থের অপব্যয় —এগুলি দেখে নেপোলিয়নের তরুণ মন ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। এই সমস্ত সাথীদের সাথে পড়াশুনা করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। এমনকি তিনি সৈনিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁর বাবা ও মার কাছে সব কিছু জানিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখলেন।

মা লেটিজিয়া নেপোলিয়নকে বুঝিয়ে চিঠি দিলেন। নেপোলিয়ন মার কাছে লিখেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে আইন ব্যবসায়ীর পুত্র বলে তাচ্ছিল্য করে। ফ্রান্সের কাছে পরাজিত একটি দেশের ছেলে বলে তাঁকে তাঁর সাথীরা এমন কি শিক্ষক মশাইরাও তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। লেটিজিয়া পুত্রের মানসিক অবস্থা অবগত হয়ে তাঁকে উপদেশ দিয়ে এ সময় তাঁর কাছে যে সমস্ত চিঠি পত্র পাঠালেন তাতে নেপোলিয়নের তরুণ মন খানিকটা শান্ত হল। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পাঁচ বৎসর কোন ক্রমে ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে পরে ফরাসীদের ওপর এ রকম অভদ্রোচিত ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবেন।

নেপোলিয়ন ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ের সঙ্গীদের বলতেন সময় ও সুযোগ এলে তিনি ফরাসীদের এ রকম অসভ্য ও বর্বর ব্যবহারের সমুচিত জবাব দেবেন। তাঁর পিতা ফরাসীদের হাতে কার্সিকাকে তুলে দিতে সাহায্য করেছেন জেনে তিনি তাঁর পিতার ওপর মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনিই হয়ে গেলেন ফ্রান্সের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী সম্রাট। ফরাসী ভূমিকেই তিনি তাঁর মাতৃভূমিরূপে সম্বোধন করেছেন, সম্মান দেখিয়েছেন। ফরাসীদের জন্যই এবং ফ্রান্সের স্বার্থেই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ফরাসীরাও তাঁকে তাঁদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জানিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ফরাসীভূমি, সৈন্যমণ্ডলী ও যোসেফাইন এ তিনটি কথা উচ্চারণ করেই ধরাধাম ত্যাগ করেন।

নেপোলিয়ন শৈশবে মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, "প্রতিভার পথ সর্বত্র উন্মুক্ত এবং বংশ গৌরবের কোন ফল নাই"। মায়ের এ কথা তিনি আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন। সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নেপোলিয়ন বংশ গৌরবের চেয়ে গুণ কৌলিণ্যকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলতেন **"Careers open to talent"**

নিম্নবংশজাত হয়েও যদি কেউ প্রতিভাবান হন তাহলে তাঁকে তিনি তাঁর যথার্থ মর্যাদা দিতে কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। তিনি আইন করে দিয়েছিলেন যে, আইনের চোখে সকলই সমান। সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়।

নেপোলিয়ন সৈনিক বিদ্যালয়ে ৫ বৎসর (১৭৭৯-১৭৮৪ পর্যন্ত) লেখাপড়া করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ৪/৫ বৎসর আগের কথা। তখন ফরাসী সমাজ ব্যবস্থা পঙ্কিল আবহাওয়ায় আবর্তিত হতে থাকে, ফরাসীরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ধর্মভাব বেশির ভাগ লোকের মন থেকেই বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও এরকম দূষিত মানসিকতা ও আবহাওয়ার ছোঁয়া লেগেছিল। ফ্রান্সের এরকম দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও নেপোলিয়ন নিজেকে সব কিছুর উর্দ্ধে রেখেছিলেন।

যে শিক্ষা মানুষকে পশুতে পরিণত করে, নিজের পরিপূর্ণ সম্ভোগ ও পরিতৃপ্তি যে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য সে রকম পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করে ও নেপোলিয়ন কোনদিন উদার ও সৎ মনুষ্য হৃদয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি বা মোহ ছিল সত্যি কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছিল শিশুর মত সরল। শৈশবে তাঁর মার শিক্ষাগুণে সৌম্যশান্ত হিমাচলের গগনভেদী-শৃঙ্গের ন্যায় তিনি নিজেকে-ফ্রান্সের এ সমস্ত পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। নেপোলিয়নের জীবনী লেখক এবট বলেছেন, "শৈশবে মাতার স্তনদুগ্ধের সহিত তিনি যে অমৃতময় শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাই ফরাসী রাজ্যের এ দূষিত শিক্ষার প্রভাব হইতে তাঁহার কর্মময় জীবনকে রক্ষাকবচের ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।"

নেপোলিয়ন সৈনিক বিদ্যালয়ে একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া করতেন। অংক শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিহাসে তিনি ছিলেন পারদর্শী। হোমারের গ্রন্থপাঠে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। রাজ-

নীতি, ইতিবৃত্ত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি তাঁর মাকে একবার লিখেছিলেন, "মা আমার কোষে তরবারি ও ও পকেটে হোমার লইয়া আমি এ পৃথিবীতে আমার পথ মুক্ত করিতে পারি।"

প্লুটার্কের জীবনী পাঠে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। গ্রীসীয় ও রোমান পুরাবৃত্তসমূহের বর্ণনা তাঁর হৃদয়মনকে আচ্ছন্ন করে দিত।

একাগ্র কর্মানুরাগ ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা যা নেপোলিয়ন তাঁর মার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে শিক্ষায় নেপোলিয়নকে জগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিল।

নেপোলিয়নের বয়স যখন ১৬ তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এবট, ক্রোনিন, লুড্উইগ প্রভৃতি সকলেই বলেছেন নোপোলিয়নের পিতা পাকস্থলীতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নেপোলিয়নের বাবা কার্লো বোনাপার্ট প্যারিসের সন্নিকটে মণ্টপ্যালিয়ার নামক একটি জায়গায় বসবাস করতেন।

নেপোলিয়নের বাবা সে সময় অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফরাসী লেখিকা মাদাম জুনোর মা পারমন কার্লোর এরকম শারীরিক অবস্থা দেখে মণ্টপ্যালিয়ারে তিনি কার্লোকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে নেপোলিয়নের মা ও সেখানে চলে যান। মাদাম জুনোর সাথে লেটিজিয়ার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাবা কার্লো বোনাপার্ট মৃত্যুবরণ করেন। এবট বলেছেন "But his disease (a cancer in the stomach often hereditary in families, and which was to prove fatal to Napoleon himself) baffled the the skill of his physician".

ফরাসী লেখিকা মাদাম জুনোর লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে

আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এরকম অসহায় অবস্থায় ও লেটিজিয়াকে তিনি বিচলিত হতে দেখেন নি। কসিকাবাসীদের মধুর ব্যবহার, সৌন্দর্যানুভূতি ও বোধশক্তি লেটিজিয়ার চরিত্রে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল। লেটিজিয়া ছিলেন খোলা মেলা মনের স্ত্রীলোক। কিন্তু যথার্থ প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক কথায় বলা যায় নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়া ছিলেন অসামান্যা নারী।

নেপোলিয়নের মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরগণের মধ্যে পাশ্চাত্যের নেপোলিয়ন ও প্রাচ্যের শিবাজীর মাতৃভক্তির কথা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। নেপোলিয়নের চরিত্র গঠনে তাঁর মায়ের যে অসামান্য প্রভাব পড়েছিল তা তিনি প্রতিনিয়ত স্মরণ করতেন।

নেপোলিয়ন যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ তাদের মায়ের ওপরই নির্ভরশীল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ফ্রান্সের সর্বত্র স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নেপোলিয়ন ৩৪ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হয়ে ওঠে ফরাসী দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটানো। তাই তিনি সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হবার পর ফরাসী দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়াস চালান।

নেপোলিয়ন নিজের জীবনেও চেয়েছিলেন একটি নিষ্ঠাবতী নারীকে। যাঁকে বিয়ে করে তিনি তাঁর জীবনকে মহীয়ান করে তুলতে পারেন। যোসেফাইনের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং যোসেফাইন যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি নেপোলিয়নকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য নেপোলিয়ন দেশের স্বার্থে যোসেফাইনকে ১৮০৯ সালে পরিত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও যোসেফাইনের সাথে যোসেফাইনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর দেখা সাক্ষাত বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল।

নেপোলিয়ন যখন যোসেফাইনকে বিয়ে করেন তখন যোসেফাইন বিধবা। দুই সন্তানের জননী এবং বয়সেও তিনি নেপোলিয়ন অপেক্ষা ছয় বৎসরের বড় ছিলেন।

যোসেফাইনের আসল নাম মেরী যোসেফ রোজ টাচার। তাঁর পিতার নাম যোসেফ গ্যাসপার্ড টাচার। গ্যাসপার্ড টাচার ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। যোসেফাইনের মাও ছিলেন ফরাসী রমণী। মার্টিনিক দ্বীপে তাদের বিরাট আখের ক্ষেত ছিল। সেখান থেকে আয়ও হত প্রচুর।

যোসেফাইন ছোটবেলাতে মার্টিনিক দ্বীপের প্রাকৃতিক নির্মল পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। তাঁদের বাড়ির চারদিকে ছিল সবুজের সমারোহ। এ সবুজ ও সতেজতা তাঁর জীবনকে দান করে ছিল উদ্যমশীলতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা, তাঁর অন্তরটা ছিল কঠিন ও কোমলের সংমিশ্রণে গঠিত।

তাঁদের আখের ক্ষেতে কাজ করত প্রায় ১৫০ জন নিগ্রো পুরুষ ও নারী। যোসেফাইন ছোটবেলায় এ সমস্ত নিগ্রো নারীদের সাথে গল্পগুজব করতে ভালবাসতেন। তাদের দুঃখের কাহিনী তাঁর শিশু মনে করুণার উদ্রেক করতো। শৈশবে তাঁর পড়াশুনার প্রতি খুব যে একটা আকর্ষণ ছিল তা বলা যায় না, তবে বইটই পড়তে তিনি ভালবাসতেন। এ সময় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল গীটার বাজানো।

এর পর কিছুদিন পড়াশুনার জন্য তাঁকে মার্টিনিক দ্বীপের বাইরে যেতে হয়। অবশ্য বছর চার পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসেন। যোসেফাইন তখন ১৬ বছরের যুবতী। এ সময় একদিন যোসেফাইন মার্টিনিক দ্বীপে তাঁদের আখের ক্ষেতে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষেতে কর্মরতা নিগ্রো রমণীদের কাছে এসে হাজির হন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে একজন বৃদ্ধা নিগ্রোরমণী অন্যান্য মেয়েদের হাত দেখছে—আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করছে। তিনি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা নিগ্রোটির

কাছে গিয়ে তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে জানার জন্য কৌতুহল প্রকাশ করলেন।

নিগ্রোরমণীটি তাঁর হাত দেখে বলে দিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বিয়ে হবে—তবে এ বিয়েতে তিনি সুখী হতে পারবেন না। এবং বিয়ের অল্পদিন পরই তিনি বিধবা হবেন। এর পর তাঁকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তিনি হবেন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী। বেশ কিছু বছর তিনি সুখী জীবন যাপন করবেন। অবশ্য তাঁর শেষ জীবন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে অতিবাহিত হবে এবং হাসপাতালে তাঁকে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এই নিগ্রো রমণীর ভবিষ্যত-বাণী যে যোসেফাইনের জীবনে ফলেছিল—এটা নিসঃন্দেহে বলা যেতে পারে।

১৬ বছর বয়সে যোসেফাইনের সাথে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলেকজাণ্ডার দ্য বোহারনিজ নামক উনিশ বছরের এক যুবকের সাথে বিয়ে হয়। পরে আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের সেনাবিভাগের অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। আলেকজাণ্ডার ১৭৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপ্লবী নেতা লাফায়াত্তের অধীনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি ফরাসী অধিকৃত মার্টিনিক দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। তাঁর পিতা ছিলেন ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের গবর্ণর। সে সূত্রে যোসেফাইনের সাথে আলেকজাণ্ডারের পরিচয় ও পরিণামে পরিণয়।

১৭৭৯ সালে স্বামীর সাথে যোসেফাইন ফ্রান্সে এসে হাজির হন। তখন ষোড়শ ল্যুই ফরাসী সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী ম্যারী অ্যাণ্টনিয়েট। অ্যাণ্ট্যনিয়েটের সাথে যোসেফাইনের পরিচয় হয়। যোসেফাইন বলেছেন, অ্যাণ্টনিয়েট ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও মিষ্ট স্বভাবসম্পন্না মহিলা অথচ হতভাগিনী—যাঁকে স্বামীর সঙ্গে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

যোসেফাইন তাঁর প্রথম স্বামীর সাথে বেশ কয়েক বৎসর সুখেই

অতিবাহিত করেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন ফ্রান্সের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। পরে স্বামীর সাথে নিজেদের বাড়ি ব্রিটানীতে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর স্বামীর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। এখানেই ১৭৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর প্রথম পুত্র ইউজিনের জন্ম হয়, তিন বৎসর পর জন্মগ্রহণ করে কন্যা হরতেনস্।

যোসেফাইনের এ সুখের জীবন বেশীদিন স্থায়ী হল না। স্বামীর সাথে ঘটল বিবাহ বিচ্ছেদ। আলেকজাণ্ডার ছিলেন অত্যন্ত কামাসক্ত। সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল। অনেক চেষ্টা করেও যোসেফাইন তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। ফলে তাঁর স্বামীর সাথে ঘটল বিবাহ বিচ্ছেদ। যোসেফাইন চলে এলেন পিত্রালয়ে। মার্টিনিক দ্বীপে। পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেনস্‌কে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

এভাবে বেশীদিন কাটানো যোসেফাইনের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। পুত্র কন্যা সহ আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন! স্বামী আলেকজাণ্ডারের সাথে একটা মিটমাট করে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে যোসেফাইনের ধৈর্য্য ও স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তাঁকে আলেকজাণ্ডারের সাথে পুনর্মিলন ঘটাতে সাহায্য করেছে। বলতে কি যোসেফাইন নিজে এসেই আবার স্বামীকে আপন করে নিয়েছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের সাথে এ পুনর্মিলনও বেশীদিন স্থায়ী হলো না। এ সময়ে ফরাসী বিপ্লবের লেলিহান বহ্নিশিখায় ফ্রান্সের আকাশ-বাতাস মুখরিত। ফ্রান্সে চলছে রোবসপীয়ারের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের ন্যাশানেল কনভেন-সনের সদস্য হন। পর পর দু' বৎসর এ জাতীয় সম্মেলনের তিনি সভাপতি নিযুক্ত হন। আলেকজাণ্ডার ছিলেন বিপ্লবী নেতা লাফায়েত ও লামার্টিনারের একান্ত অনুগত।

ফ্রান্সের Revolutionary Tribunal হঠাৎ কোন কারণ না দেখিয়েই আলেকজাণ্ডারকে গ্রেপ্তার করে। পাঠিয়ে দেয় জেলে।

তাঁর বুদ্ধিমত্তা, ন্যাশানেল কনভেনসনে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি—এগুলিই হলো আলেকজান্ডারের পতনের মূলহেতু। Abbot বলেছেন, 'When he was consigned to the dungeons of the Luxembourg his only crimes were rank and merit.'

যোসেফাইনকেও বিনা কারণে গ্রেপ্তার বরণ করতে হল। তাঁকেও নিয়ে যাওয়া হল জেলে। স্বামীর মত যোসেফাইনকেও মৃত্যুর জন্য দিন গুণতে হয়। এ জেলখানার বধ্যভূমিতে সাত হাজার নরনারীর গলা কাটা হয়েছে—রক্তের স্রোতে ভেসে গেছে জেলখানা সংলগ্ন মাটি।

এ সাত হাজার নরনারীর বেশীর ভাগই বিদগ্ধজন ফরাসী সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত। ১৭৯৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জেকোবিন ক্লাবের নেতা রোবসপীয়ারই দিয়েছেন এঁদের মৃত্যুদণ্ড। যোসেফাইনকে যে জেলে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে একজনও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। অতএব যোসেফাইনও যে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবেন না—এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যোসেফাইনকে যখন রোবসপীয়ারের হুকুমে জেলে আনা হচ্ছিল—তাঁর দুশিশুসন্তান তখন গৃহে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিষ্ঠুর ঘাতকের হৃদয় কিন্তু এতে এতটুকু বিচলিত হয়নি। দুশিশুসন্তানকে একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহের ওপর ফেলে রেখে যোসেফাইনকে চলে আসতে হয়েছে জেলে।

পরে ইউজিন ও হরতেনস্ ভার্সালাইসে এক মাসীর কাছে তাদের এ অসহায় অবস্থার খবর পাঠান এবং সম্ভবতঃ তাদের মাসী এ সময় তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

যোসেফাইনের সুন্দর ব্যবহার, মিষ্ট স্বভাব ও নম্রতা জেলখানার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর এ রকম সুন্দর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর পুত্র ও কন্যার সাথে চিঠিপত্র লেখারও অনুমতি দেন।

জেলে থেকে বুদ্ধিমতী যোসেফাইন বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর

স্বামী আলেকজাণ্ডারকে অল্পদিনের মধ্যেই গিলোটিনে প্রাণ দিতে হবে। তিনি এটা উপলব্ধি করে ফ্রান্সের নতুন যুদ্ধমন্ত্রী Citizen Prosper Sigas এর কাছে তাঁর স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে একটি আবেদন পেশ করেন। যুদ্ধমন্ত্রী কমিটি অব জেনারেল সেফ্‌টির (Committee of General Safety) কাছে আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান। এই আবেদনে কাজও হয়েছিল। যোসেফাইনকে তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করার অনুমতিও দেওয়া হল। দুজনের দেখা হল—এক অদ্ভুত পরিবেশে। (অর্থাৎ দুজনেই যখন গিলোটিনে প্রাণ দেবার অপেক্ষায় রয়েছে)। কতদিন পরে দুজনের এ মিলন। যোসেফাইনের ভাষায় বলি—

"Alexander wept with joy when he once more beheld me but as we were separated he became calm and collected. He embraced me more like a friend than ahusband and reminded our children to my care"

কিন্তু এর অল্প কয়েক দিন পরই আলেকজাণ্ডারকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলো—যোসেফাইনের চোখের জলে কারাগার ভেসে গেল। বিচারের প্রহসন করে রোবস্‌পীয়ারের সন্ত্রাসের রাজত্বে কত নিরপরাধ লোককেই না প্রাণ দিতে হয়েছে এভাবে। যোসেফাইনকেও একই ভাবে প্রাণ দিতে হত—সৌভাগ্যের বিষয় দুদিনের মধ্যেই রোবস্‌পীয়ারের পতন ঘটল। সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারই শেষ ব্যক্তি যিনি রোবস্‌পীয়ারের সন্ত্রাসের রাজত্বে গিলোটিনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

রোবস্‌পীয়ার প্যারিসের জনতার ক্ষোভে পতিত হল। তাঁরই সৃষ্ট গিলোটিনে তাঁকে প্রাণ দিতে হল। সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটল। যোসেফাইন ছাড়া পেলেন। জেকোবিন ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ক্লাবের বহু সদস্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। বিপ্লবী ট্রাইব্যুনলের ক্ষমতা স্থগিত রাখা হল।

আলেকজাণ্ডার বোহারনিজ যদি আর মাত্র দুদিন বেঁচে থাকার সুযোগ পেতেন, তা হলে যোসেফাইন শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁরই পত্নী-রূপে থাকতে পারতেন।

যোসেফাইন নেহাত্ত বরাত জোরে বেঁচে গেলেন। রোবস্‌পীয়ারের পতনের পর এম ট্যালিয়ন (ডায়রেক্টর সভার একজন সক্রিয় সদস্য) ক্ষমতায় এলেন। যোসেফাইনের সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যোসেফাইন ধীরে ধীরে তাঁর অতীত জীবনের কথা ভুলতে আরম্ভ করলেন। নেপোলিয়ন তখনো বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তবে এর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন।

নেপোলিয়ন ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিয়েনের সৈনিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ফ্রান্সের সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তির জন্য পরীক্ষা দেন। এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বিতীয় লেফটেনণ্টের পদ লাভ করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর নেপোলিয়ন সেখান থেকে দ্রুতগতিতে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবকে প্রথমে বিদেশী রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সের নিছক একটি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলে মনে করেন। ফরাসী দেশের এই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে-ইংলণ্ড ও স্পেন একযোগে ফরাসী দেশের সমুদ্রতীরবর্তী তুলো বন্দর আক্রমণ করে। ফরাসী দেশের জনগণ ইংলণ্ড ও স্পেনের নৌবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এ কাজের ভার পড়ে ছিল কার্ণট নামক এক সেনানায়কের হাতে।

কার্ণটের সমরনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না—কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক।

এসময় তুলো নগরীকে রক্ষা করার জন্য ডাক পড়ল তরুণ বীর নেপোলিয়নের। নেপোলিয়নের রণকৌশল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৈন্য পরিচালনায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতাগুণে ফ্রান্সের পক্ষে এ যুদ্ধ জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। তবে ইংলণ্ড ও স্পেনের এ আক্রমণের পেছনে

যে ফ্রান্সের রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র ছিল এটা নিশ্চিত এযুদ্ধে জয়লাভের পর নেপোলিয়নের ক্ষমতা ও রণকৌশল সম্পর্কে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল হলেন।

তুলো বন্দর রক্ষা করার পর নেপোলিয়ন ফরাসী সেনাপতি ডুগোমির সাথে মার্শেলিস নগরে গমন করেন। এখানকার সামরিক অফিসারদের এক সভায় ক্ষুদে নেপোলিয়নকে দেখে ডুগোমির এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'এ ক্ষুদে কর্মচারিটি কে? কোথা থেকে একে সংগ্রহ করলেন?' ডুগোমির উত্তরে বীরত্ব ব্যঞ্জক কণ্ঠে বন্ধুটিকে জানিয়ে ছিলেন যে, ক্ষুদে কর্মচারিটিব নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তুলোর যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে সাহস ও রণ কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে ফ্রন্সের সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত। প্রকৃত পক্ষে তুলোয় তাঁরই যুদ্ধ কৌশলে ইংলণ্ড ও স্পেনের সমবেত নৌবাহিনীকে ফ্রান্সের পক্ষে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে। ডুগোমির আরও বললেন যে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা দেখতে পাবেন এ ক্ষুদে কর্মচারিটি তাঁদের যে কোন লোকের চেয়ে সহাসিকতা ও রণকৌশলে শ্রেষ্ঠ।

এর পর জাতীয় সম্মেলন নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল ভাগ রক্ষার ভার দেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এ অঞ্চলে ইংলণ্ড ও স্পেনের নৌবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেন। এরূপ দুরূহ কার্য সম্পাদনের জন্য ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদে উন্নীত হন। এবং ইতালীর নাইস প্রদেশ ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সাথে মিলিত হবার জন্য গমন করেন। এখানে এসে নেপোলিয়ন ফরাসী সৈন্যগণের অপদার্থতা দেখে ক্ষুব্ধ ও যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হন।

নেপোলিয়ন এখানকার অবস্থা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদলকে নাইস থেকে বিতাড়িত করার রণকৌশলও তিনি ঠিক করে ফেললেন। 'নাইসের' যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সৈন্যগণ সম্পূ

স্তূপে বিধ্বস্ত হলো। এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন ডুমার্ত্তিন। ডুমার্ত্তিন নেপোলিয়নের অসাধারণ রণ নৈপুণ্যে বিস্মিত হলেন। এই যুদ্ধ জয় নেপোলিয়নের জীবনের চরম উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছিল।

কিন্তু এ সময়ে এক গোপন চক্রান্তে নেপোলিয়ন জাতীয় সম্মেলন কর্তৃক বন্দী হন। একজন সাধারণ অপরাধীর ন্যায় হাতে হাতকড়া দিয়ে তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে Revolutionary Tribunal এর নির্দেশে দুপক্ষকাল কারাগারে কাটাতে হল।

সৌভাগ্যক্রমে প্যারিস থেকে নির্দেশ এলো নেপোলিয়নকে যেন অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন গিলোটিনে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

নেপোলিনয়ন মুক্ত হলেন বটে কিন্তু তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পদ থেকে অপসারিত করা হল। দেওয়া হল পদাতিক বাহিনীতে। নেপোলিয়ন এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। ফিরে এলেন মার্শেলিসে। মিলিত হলেন তাঁর মা ও ভাইবোনদের সাথে। ১৭৯৪ সালের শরৎকালের কথা। তিনি এসময়ে বেশকিছুদিন আলস্যে দিন কাটান। রাজনীতি ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সংক্রান্ত বিবিধ পুস্তকের মধ্যে তিনি মনোনিবেশ করেন।

নেপোলিয়নের মত এরূপ একজন সেনানায়কের পক্ষে এভাবে আলস্যে দিন কাটান অসহ্য হয়ে উঠল। ১৭৯৪ সালের মে মাসে তিনি আবার প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন চাকরির সন্ধানে।

কিন্তু কোন চাকরি মিলল না। যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকেই হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন। প্যারিসে কাজ পাওয়ার আশা ত্যাগ করে তিনি তুরস্কে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তুরস্ক সরকারের অধীনে কোন চাকরিতে যোগদান করবেন এ ছিল তাঁর বাসনা। অন্তত অনাহারে মরার হাত থেকে ত রক্ষা পাবেন।

এমন সময় তিনি তার মার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন।

মায়ের চিঠিতে মার্সেলিসে তাঁদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মা লিখেছেন তাঁদের পরিবারের অর্থসঙ্কট চরমে উঠেছে, জীবন ধারণ করা আর সম্ভব নয় দেখে নেপোলিয়নকে তিনি এ চিঠি দিয়েছেন। মায়ের এ চিঠি তাঁকে অস্থির করে তুলল। স্থির করলেন আত্মহত্যা করে এ সমস্ত চিন্তার হাত থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করবেন। ভাবলেন যে ছেলে মাকে, ভাইকে খেতে দিতে পারেনা সে ছেলের জীবন রেখে কি হবে? উন্মত্তের ন্যায় কপর্দকশূন্য নেপোলিয়ন নদীর তীরে ছুটে গেলেন নদীবক্ষে আত্মহত্যা করার সংকল্প নিয়ে।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর সাথে দেখা হল তাঁর পুরানো বন্ধু ও সহকর্মী 'ডিমাসিস' এর সাথে।

ডিমাসিস ত নেপোলিয়নের এ অবস্থা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত। নেপোলিয়নকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কি হয়েছে? নেপোলিয়নের করুণ চাহনির মধ্যে তাঁর অসহায় অবস্থা ফুটে উঠেছে। নেপোলিয়ন সবিস্তারে ডিমাসিসএর কাছে সব বললেন।

ডিমাসিস তাঁর শোচনীয় কাহিনী শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর হাতে ছয় হাজার ডলারের স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করলেন। নেপোলিয়ন দুঃখিনী মায়ের কাছে সে স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করে তাঁদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন এবং নিজেও আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচলেন।

'হায় বিধাতা, তোমার করুণা বোঝা ভার. নেপোলিয়নের জীবন-দীপ এভাবে নির্বাপিত হলে ফরাসী দেশের এ দুর্দিনে কে তাকে রক্ষা করত? বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী বা স্বাধীনতার বাণী কে পরিব্যাপ্ত করত? তাই হয়ত করুণাময় বিশ্বপিতা তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।'

ফরাসী দেশের চারদিকে তখন চলছে ঘোর অরাজকতা। ইতালীতে ফরাসী সেনাগণ অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদের হাতে বার বার পরাজিত হচ্ছে

যুদ্ধ পরিচালনা করার মত সামর্থ সেখানকার কোন ফরাসী সেনানায়কের নেই। সেখানে কোন অভিজ্ঞ সেনানায়ককে পাঠাতে না পারলে অচিরে যে ফ্রান্সের ভরাডুবি হবে এটা ফ্রান্সের কমিটি অব জেনোরেল সেফটির (যাদেব হাতে ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা) বুঝতে অসুবিধে হল না। আলপ্‌স্‌ পর্বতে (নাইসে) নেপোলিয়নের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা, তাঁর রণকৌশলের কথা অনেকের মনে পড়লো।

নেপোলিয়ন কমিটি ডেকে পাঠাল। এবং তাঁকে ন্যাশনেল কনভেনসনের মন্ত্রণাদাতারূপে নিযুক্ত করলেন। এর পর ন্যাশনেল কনভেনসন ফ্রান্সের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করল। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দেওয়া হল পাঁচ সদস্যের একটি ডাইরেক্টরী সভার ওপর। আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হল পাঁচশত পরিষদ ও প্রাচীন পরিষদ নামক দুটি প্রতিনিধি সভার হাতে।

কিন্তু এ নতুন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্যারিসের জনতা জেহাদ ঘোষণা করল। চল্লিশ হাজার জনতা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের স্থান তুইলারির রাজপ্রাসাদ অক্রমণের জন্য অগ্রসর হল। রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সেনানায়ক মেনোকে—এ বিক্ষুব্ধ জনতার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। সেনাপতি মেনো জনতার ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কর্তাদের তখন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। তরুণ বীর নেপোলিয়ন এ সমস্ত জিনিস নিরীক্ষণ করছেন—আর ভাবছেন রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অসহায় অবস্থার কথা।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন তখন প্রধান সেনাপতি পল ব্যারাসের ওপর প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিহত করার ভার দেয়। পল ব্যারাস রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কাছে নেপোলিয়নকে এ কাজের ভার দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ব্যারাস তুলোর যুদ্ধে নেপোলিয়নের দক্ষ সৈন্য পরিচালনার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। ব্যারাসের প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় সম্মেলন মেনে নিল। নেপোলিয়ন মাত্র কয়েকটি গোলার

আঘাতে প্যারিসের এ বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনকে তিনি বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

নেপোলিয়নের খ্যাতির সীমা রইল না। তিনি অন্তর্দ্দেশীয় সৈন্য বাহিনীর প্রধান নায়কের পদ প্রাপ্ত হলেন। প্যারী নগরীর শাসন ভারও তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। তখন নেপোলিয়ন মাত্র ২৫ বৎসরের যুবক। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের, ২৬শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হল পরের দিন থেকে শুরু হল ডাইরেক্টরী সভার শাসন। বারোস ডাইরেক্টরী সভার একজন সদস্য নিযুক্ত হলেন।

নেপোলিয়নের বুদ্ধি কৌশলে ও সাহসিকতায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন রক্ষা পেল। ফ্রান্সে এলো শান্তি। বিপ্লোবত্তর ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কিছুটা অন্তর্হিত হল। কিন্তু তখন ফরাসী দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে। হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্যারিস নগরীর ধনীর দুলালরা নিজেদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। নেপোলিয়নের হৃদয় ছিল স্নেহ, মায়া, মমতা ও করুণার দীপ্ত প্রতীক। এ সময়ে নেপোলিয়ন দেশের জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এতে দেশের জনগণের আকর্ষণ তাঁর প্রতি আরো গাঢ় হল।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বিধবা যোসেফাইন গিলোটিনে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্যারিসে তিনি তৈরি করেছেন সুন্দর একটি বাড়ি। সেখানে পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেনসকে নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। ডাইরেক্টরী সভা এ সময় নেপোলিয়নের ওপর প্যারিসের জনসাধারণের হাতে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি নির্দেশ জারি করেন। এ সমস্ত জনসাধারণ ভবিষ্যতে আর যাতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে না পারে সে চিন্তা করেই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী সভার নির্দেশ মত প্যারিসের জনগণের বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালিয়ে তাদের

সব অস্ত্র শস্ত্র বাজেয়াপ্ত করলেন। যোসেফাইনের স্বামী আলেকজাণ্ডার বোহারনিজের তরবারিটিও তাঁর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল।

এর দুদিন পর যোসেফাইনের পুত্র ইউজিন নেপোলিয়নের কাছে এসে তার স্বর্গীয় পিতা আলেকজাণ্ডারের তরবারিটি ফেরৎ চাইল। ইউজিন তখন মাত্র ১২ বছরের বালক। শান্ত, সুন্দর, সৌম্যকান্তি আলেকজাণ্ডারের পুত্র ইউজিনের মধুর ব্যবহার ও পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে নেপোলিয়ন মুগ্ধ ও বিগলিত। নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের তরবারিটি ইউজিনকে ফিরিয়ে দিলেন।

ইউজিন নেপোলিয়নের সহৃদয়তায় বিস্মিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করল—আবেগে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল। নেপোলিয়ন ভাবতে লাগলেন দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক ইউজিনের পিতৃভক্তির কথা। সন্তানের চরিত্র গঠনে জননীর প্রভাব সম্পর্কে নেপোলিয়ন অবহিত ছিলেন। মা ল্যাটিজিয়ার প্রভাব তাঁর জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা তিনি জানেন। তাঁর বুঝতে ভুল হল না যে এ রকম সন্তানের জননী নিশ্চয় অতিশয় গুণান্বিতা।

পুত্র ইউজিনের প্রতি নেপোলিয়ন যে দয়া প্রদর্শন করলেন তাতে যোসেফাইনের কোমল হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হল। কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্য একদিন যোসেফাইন নেপোলিয়নের সাথে দেখা করলেন। যোসেফাইনের সুমিষ্ট ব্যবহার, মার্জিত রুচি, মহৎ নারী-স্বভাব, সর্বোপরি মাতৃত্বের নিদর্শন নেপোলিয়নকে বিমোহিত করল। গভীর শ্রদ্ধাও সম্ভ্রমের সাথে নেপোলিয়ন যোসেফাইনের সাথে আলাপ করলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই নেপোলিয়ন যোসেফাইনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

যোসেফাইন নেপোলিয়ন অপেক্ষা বয়সে প্রায় ৬ বৎসরের বড় ছিলেন কিন্তু যোসেফাইনের অপূর্ব শারীরিক গঠন তাঁর তন্বীদেহ, চক্ষুযুগল, ছোট ছোট হাত পা, সর্বোপরি মিষ্ট ব্যবহার, কোমল হৃদয় নেপোলিয়নকে যোসেফাইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল।

এ সময়ে নেপোলিয়নের অন্যদিকে মন দেওয়ার বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। এত উঁচুপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণ কাজে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে তখন তিনি। কিন্তু তাঁর নারী-প্রীতি ছিল অপরিসীম। জীবনে তিনি বহুবার বিভিন্ন চরিত্রের নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

নেপোলিয়ন যখন সেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট সে সময় তিনি এমা নাম্নী এক রূপসীর প্রেমে আবদ্ধ হন। এমা নেপোলিয়নকে পছন্দ করত না। নেপোলিয়নের প্রেম পত্রগুলি এমা অবজ্ঞাভরে ফেলে দিত। হেসে বলত যে, "এ প্রেম পাগল ছোকরার এমন কি আছে যে তার সাথে প্রেম করতে হবে।"

যতদূর জানা যায় নেপোলিয়ন জীবনের শুরুতে দৈহিক প্রেমের স্বাদ পান এক বারবনিতার কাছে। তখন নেপোলিয়ন মাত্র ১৮ বৎসরের বালক। প্রকৃত পক্ষে এ বারবনিতা নেপোলিয়নের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল শুধু একটি কারণে। এ বারবনিতার জীবনের করুণ কাহিনী নেপোলিয়নকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি জানতেন যে, এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলাটি এক হঠকারী উচ্চ-পদস্থ মিলিটারী অফিসার দ্বারা প্রতারিত। ফলে সমাজে তার কোন স্থান হল না। বাঁচার তাগিদে তাকে এ বারবনিতার জীবন বেছে নিতে হয়েছিল।

নেপোলিয়ন ১৮ থেকে ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। ফ্রান্সের নানান ব্যাপারে তাঁকে জড়িয়ে থাকতে হতো। তবে তুলোর সাফল্যজনক অভিযানের পর তিনি যখন ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন তখন অল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় পেয়েছিলেন। নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সত্য, তবে তাঁর আকর্ষণ কোনদিন নোংরামিতে পর্যবসিত হয়নি।

সে সময় মার্শেলাইস শহরে ফ্রাঙ্কিস ক্লেরি নামক একজন বড়

ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর দুটি কন্যা ছিল। একজনের নাম জুলি, অন্যজনের নাম ডিজায়ারী। জুলির বয়স ছিল ২২ আর ডিজায়ারীর ১৬। এ পরিবারের সাথে নেপোলিয়নের দাদা যোসেফের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এবং যোসেফ জুলির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নেপোলিয়ন ডিজায়ারীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডিজায়ারীকে বিয়ে করার জন্য তাঁর মনে জাগল উদগ্র বাসনা। ডিজায়ারীরও নেপোলিয়নের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। নেপোলিয়ন বলতেন ডিজায়ারী হচ্ছে তাঁর স্বপ্নের রাণী, তাঁর কামনা, তাঁর কল্পনা।

এ সময় নেপোলিয়নের ডাক পড়ল ইতালীতে। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। নেপোলিয়ন ছুটে চললেন ইতালীতে। ডিজায়ারীকে দেখার জন্য তাঁর মন উৎকণ্ঠায় ভরে যেত। সময় পেলেই ইতালী থেকে চিঠি লিখতেন। এবং ডিজায়ারীকে গান শেখার জন্য উপদেশ দিতেন। ডিজায়ারীর মিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলকে মুগ্ধ করে দিত।

এর মধ্যে যোসেফের সাথে জুলির বিয়ে হয়ে গেছে। লেটিজিয়া এবং মাদাম ক্লেরির সম্মতিতে। কিন্তু মাদাম ক্লেরি ডিজায়ারীকে নেপোলিয়নের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। তিনি স্পষ্টই বললেন ',I ' ve quite enough with one Bonaparte in the family."

তবে মাদাম ক্লেরির এ অনীহা নেপোলিয়নকে ডিজায়ারীর মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। নেপোলিয়ন ও ডিজায়ারীর কাছ থেকে উত্তর পেতেন না। হয়ত চিঠিপত্রগুলি ডিজায়ারীর হাতে গিয়ে পৌঁছত না। ভেতরে ভেতরে মাদাম ক্লেরি ডিজায়ারীকে অন্যত্র বিয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেললেন। নেপোলিয়ন খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে নেপোলিয়ন ডিজায়ারীকে ভুলে যেতে বাধ্য হলেন। এখানেই নেপোলিয়ন ও ডিজায়ারী উপখ্যানের সমাপ্তি ঘটল।

এর পরই নেপোলিয়নের সাথে যোসেফাইনের পরিচয়। তার কিছুটা বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যোসেফাইন নেপোলিয়নকে স্বামী হিসেবে পেতে যে খুব আগ্রহী ছিলেন একথা বলা যায় না—তবে নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে বিয়ে করার জন্য মনে প্রাণে তৈরী ছিলেন। এবং ঘন ঘন যোসেফাইনের বাড়ি যেতে আরম্ভ করলেন। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতেন, যোসেফাইনকে তাঁর মনের কথা জানাতেন—সময় সময় সখ করে তিনি যোসেফাইনের হাত দেখে—তাঁর ভবিষ্যত সম্বন্ধে দু'চারটা ভালো ভালো কথা বলতেন। এভাবে যত দিন যায় তত দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা মধুর হয়ে উঠতে থাকে।

পল ব্যারাস (যিনি প্রথমে ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং পরে প্রধান ডাইরেক্টরের পদে উন্নীত হন) যোসেফাইনের বাড়িতে যাতায়ত করতেন। পল ব্যারাসের সাথে যোসেফাইনের গোপন প্রণয় ছিল। নেপোলিয়ন সেটা জানতে পারলেন। নেপোলিয়ন এতে খুবই আঘাত পেলেন। কিছু দিন তিনি যোসেফাইনের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। নেপোলিয়নের অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। তিনি যোসেফাইনের মনের কথা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন যোসেফাইন কি সত্যি সত্যি পল ব্যারাসকে ভালবাসেন? এবং তাঁকেই কি যোসেফাইন তাঁর জীবনসঙ্গী করতে চান? নেপোলিয়ন তাঁর সঠিক উত্তর জানতে চান।

যোসেফাইন অকপটে স্বীকার করলেন যে এক সময় তিনি পল ব্যারাসকে ভালবাসতেন। তখন তিনি পল ব্যারাসের প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যোসেফাইনের দৈহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। তিনি আরও জানালেন যে এখন পল ব্যারাসের সাথে তাঁর আর সে সম্পর্ক নেই। পল ব্যারাসের বন্ধন থেকে তিনি অনেক দিন নিজেকে মুক্ত করেছেন। Cronin বলেছেন, "She (Josephine)

had been Barras's mistress though she was so no longer."

নেপোলিয়ন যোসেফাইনের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। তিনি ভাবলেন, যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বাস্তবদিক থেকে চিন্তা করলে এটা এমন কিছু দোষেরও নয়। নেপোলিয়ন যোসেলাইনকে তাঁর মনের কথা জানালেন। দিলেন বিয়ের প্রস্তাব।

নেপোলিয়ন এ ব্যাপারটা পল ব্যারাসকে সবিস্তারে বললেন। নেপোলিয়নের মনে ভয় ছিল ব্যারাস হয়ত এ বিয়েতে আপত্তি জানাবেন। ব্যারাস আপত্তি জানালেন না। সম্মতি দিলেন। শুধু সম্মতি জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি নেপোলিয়নকে জানালেন যে, নেপোলিয়নের সাথে যোসেফাইনের বিয়ে হলে—ডাইরেক্টরী সভা নেপোলিয়নকে ইতালী অভিযানের সর্বাধ্যক্ষ করে দেবে। ব্যারাস তখন ডাইরেক্টরী সভার প্রধান। ব্যারাসের নিজের পদের নিরাপত্তার জন্য নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের সমর্থন প্রয়োজন। বিশেষতঃ নেপোলিয়ন হচ্ছেন সে সময়কার ফ্রান্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রতাপশালী লোক। অতএব তাঁর সাহায্য ব্যারাসের একান্তভাবে কাম্য।

কিন্তু এ বিয়েতে যোসেফাইনের মনে সন্দেহ ও ভীতি দুইই ছিল, মনে মনে ভাবলেন এ বিয়েতে সম্মতি দিয়ে তিনি ভুল করছেন না ত? কেন না তাঁর সে আগের রূপ ও যৌবন এখন আর নেই। যা দিয়ে তিনি বীর নেপোলিয়নের মত একজন যুবককে তৃপ্ত করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি নেপোলিয়নের চেয়ে বয়সে ছয় বছরের বড়। বিয়ের পর নেপোলিয়ন যদি তাঁকে ভালো না বাসে তখন কি উপায় হবে? এরূপ সাত পাঁচ ভেবে যোসেফাইন বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন। বন্ধুকে জানান, "Being now past the heyday of youth, can I hope long to preserve that ardonr of attachment, which in the General, resembles a fit of delirium."

নেপোলিয়নের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমরদক্ষতা, মানুষের হৃদয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা, সর্বোপরি ফ্রান্সের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর এত জনপ্রিয়তা—এ সব দেখে যোসেফাইন বিস্মিত, যোসেফাইন বিগলিত। যোসেফাইন নেপোলিয়নকে বিয়ে করতে সম্মতি দিলেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ নেপোলিয়নের সাথে যোসেফাইনের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হল। তবে কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়নি। বর-কনেকে গীর্জায়ও যেতে হয়নি। কোন পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয়নি এ বিয়েতে।

সন্ত্রাসের রাজত্বে ফ্রান্সে বিয়েটাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে ধরা হতো না। বিপ্লবী শাসনতন্ত্র বিয়ের ব্যাপারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে একটি অন্ধ কুসংস্কার বলে মনে করতো। সমস্ত গীর্জায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সন্ত্রাসের রাজত্বের কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল গীর্জা ইত্যাদি ধর্মস্থান সমূহ মানুষের শোষণ যন্ত্র ভিন্ন আর কিছু নয়। ধর্মীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য—এ সমস্ত শোষণ যন্ত্রকে ব্যবহার করে। হতভাগ্য মুর্খের দল হয় প্রতারিত।

তাই বিপ্লবী শাসনতন্ত্র ধর্মকর্ম বা ভগবানকে ফ্রান্স থেকে বিদেয় করল।

নেপোলিয়ন তখন ২৬ বৎসরের যুবক, আর যোসেফাইনের বয়স তখন ৩২। ফ্রান্সের বিয়ে সংক্রান্ত রীতি অনুযায়ী তখন দুজনকেই বয়সের সার্টিফিকেট দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু কারো কোন বয়সের সার্টিফিকেট ছিল না তাই বাধ্য হয়ে নেপোলিয়নকে দেখাতে হয়েছে দাদা যোসেফের বয়সের সার্টিফিকেট, আর যোসেসাইনকে ক্যাথারিনের।

রেজিষ্ট্রার এসে যথারীতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করল। দুজনকে আইন সঙ্গত উপায়ে বিয়ে দিয়ে দিল। পল ব্যারাস, ট্যালিয়ন এবং জেরোম কামলেট (জোসেফাইনের আইন উপদেষ্টা) রইলেন এ

বিয়ের সাক্ষী।

নেপোলিয়ন ধর্মীয় রীতিনীতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। বিশেষত যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেণ্টহেলনার যখন তিনি বন্দী জীবন যাপন করছিলেন সে সময় তিনি প্রায়ই Newtestmmt নিয়ে বসতেন এবং উক্ত পুস্তক থেকে জেসাসের উপদেশাবলী বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন।

নেপোলিয়ন ফরাসী সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ফ্রান্সের গীর্জাগুলি পুনরায় জনসাধারণের জন্য খুলে দেন। এ গীর্জাগুলির তিনি সংস্কার সাধনও করেন তাঁর রাজ্যভিষেকের পূর্বে তিনি ও যোসেফাইন গীর্জায় গিয়ে আবার নতুন করে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের এ বিয়েতে নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়া ও তাঁর বোন পলিনের ঘোর আপত্তি ছিল। একজন বিধবাকে বিয়ে করার ব্যাপারে মা লেটিজিয়া কিছুতেই মত দিতে পারেননি। তবে নেপোলিয়ন অনেক কষ্টে পরে মার সম্মতি আদায় করেছিলেন।

যোনেফাইনের পুত্র ও কন্যা প্রথমে এ বিয়েতে সম্মতি দিতে চাননি। যোসেফাইন কন্যা হরতেনসের মনে একটু সন্দেহ ও ভয় ছিল। মা যদি আবার বিয়ে করে তাহলে হয়ত মা ও নতুন স্বামীর কাছ থেকে সেই স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা পাবেন না যেটা তাঁরা এত দিন মায়ের কাছ থেকে পেয়ে আসছিল। তাই অনেক চিন্তা ভাবনা করেই তাঁরা মায়ের এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তাদের এ সন্দেহ যে কতখানি অমূলক ছিল তাঁদের প্রতি নেপোলিয়নের পরবর্তী সময়ের ব্যবহারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরতেনসকে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ভাই ল্যুই বোনাপার্টের সঙ্গে যাকে নেপোলিয়ন পরে হল্যাণ্ডের সম্রাট পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যোসেফাইন পুত্র ইউজিনকে নেপোলিয়ন নিজের সন্তানের মত স্নেহ

করতেন এবং তাঁকে তিনি বেভেরিয়ার রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ন ইউজিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করতেন। তার ওপর নেপোলিয়নের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

যোসেফাইন নেপোলিয়নকে তাঁর ভবিষ্যত জীবনে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তা নেপোলিয়ন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি।

নেপোলিয়ন বিয়ের পর যোসেফাইনকে নিয়ে রু চেন্টারইয়েনের সুন্দর বাড়িতে চলে আসেন মার্চ মাসের শীতের রাতে। অবশ্য নেপোলিয়নকে বিয়ের দুদিন পরই ইতালীতে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে চলে যেতে হল। সুতরাং বিয়ের পর মাত্র দুদিন তিনি যোসেফাইনের সঙ্গ সুখ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

যোসেফাইনের একটি থাঁদা নাকযুক্ত কুকুর ছিল। সে কুকুরটি যোসেফাইনের সঙ্গে থাকতো। এমন কি যোসেফাইনকে যখন বৈপ্লবিক শাসনতন্ত্রের নির্দেশে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখনো সে কুকুরটি যোসেফাইনের সঙ্গে ছিল। কুকুরটির নাম ছিল ফরচুন। নতুন আগন্তুক নেপোলিয়নকে ফচুরন সহ্য করতে পারত না। তাঁকে দেখলেই ফরচুন চিৎকার চেঁচামেচি করতো। একদিন নেপোলিয়নের পায়ে কামড় বসিয়ে দিয়ে তাঁর পায়ের গোড়ালি থেকে মাংস তুলে নিয়েছিল।

নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে বিয়ের পর বলেছিলেন, "I ask neither eternal love nor fidelity" "but only truth, unlimited frankness" —তিনি আরো বললেন যে, "The date when you will say to me, I love you less" will be the last day of my love or the last day of my life" নেপোলিয়নের এই উক্তি থেকে যোসেফাইনের প্রতি তাঁর প্রেম যে কত গভীর ছিল তার প্রমাণ মিলে।

নেপোলিয়ন বিয়ের দুদিন পরই প্রাণাধিক যোসেফাইনকে

প্যারিসে রেখে তিনি নাইসএ এসে উপস্থিত হন। এখানে এসে তিনি পুর্বের ন্যায় ফরাসী সৈন্য বাহিনীর অসহায় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হন। চার দিকে অষ্ট্রীয়ান সৈন্য দক্ষ সেনানায়ক দ্বারা পরিচালিত। অষ্ট্রীয়ার সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৮০০০০ হাজার, আর সেখানে ফরাসীদের মাত্র ৩০০০০ হাজার। তদুপরি ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। ডাইরেক্টরী সভা সৈন্যদের ঠিকমত মাহিনা পত্র ও দিতে পারছে না। এমন কি সৈন্যদের যুদ্ধের পোষাক পরিচ্ছদেরও অভাব। তদুপরি ইতালিতে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর যাঁকে অধিনায়ক করে পাঠিয়েছে তাঁর নাম কার্ণট। কার্ণট ছিলেন একজন অপদার্থ, লম্পট ও মদ্যাসক্ত ব্যক্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করার মত তাঁর কোন ক্ষমতায় ছিল না। নেপোলিয়ন তখন মাত্র ২৭ বৎসরের যুবক। সুদক্ষ সেনা নায়ক।

সমগ্র ইয়োরোপ তখন ভীত, সন্ত্রস্ত। ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে না পারলে যে তার ঢেউ এসে ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজতন্ত্রের ওপর কঠোর আঘাত হানবে। এটা ইয়োরোপের রাষ্ট্রনায়কদের বুঝতে অসুবিধে হলো না। ফরাসী বিপ্লবের 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্যের' বাণী দ্বারা ইয়োরোপের সাধারণ লোক উদ্বুদ্ধ হলে ইয়োরোপের মাটিতে রাজতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী।

তাই একদিকে ইংল্যাণ্ড আর একদিক থেকে অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর। একমাত্র নেপোলিয়নই এ সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন তাঁর অসামান্য রণকৌশল, বুদ্ধিমত্তা, সাধারণ মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার অসামান্য ক্ষমতা গুণে।

ইতালীতে ফ্রান্সের ত্রিশ হাজার অসহায় বুভুক্ষু সৈন্যদের সামনে নেপোলিয়ন উপস্থিত হয়ে অতি সহজেই তাদের মন জয় করলেন। তাঁর রণকৌশল কি হবে তাও তিনি স্থির করে নিলেন। সৈন্যদের সামনে ঔজস্বিণী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তাদের বললেন, 'আমি

তোমাদিগকে জগতের উর্বরতম অঞ্চলে লইয়া যাইতেছি……যেখানে তোমরা যশ ও অর্থ দুই ই লাভ করিতে পারিবে'—

এভাবে সৈন্যদের মনে আশা ও বলের সঞ্চার করে নেপোলিয়ন দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে ইতালীতে একের পর এক রাজ্য জয় করলেন। পোপকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন লম্বার্ডি, ভেনিস প্রভৃতি একে একে তাঁর করতলগত হল। অষ্ট্রীয়া সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত হয়ে ইতালী থেকে বিতাড়িত হল। উত্তর ইতালী কয়েকটা অংশ একত্রিত করে C I S— Alpine Republic নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হল।

নেপোলিয়ন জানতেন ইতালীবাসীর মন জয় করতে না পারলে এখানে ফ্রান্সের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্যদের স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে কোন ইতালীবাসী যেন ফরাসী সৈন্য দ্বারা অত্যাচারীত বা লুণ্ঠিত না হয়। কেউ এ আদেশ লঙ্ঘন করলে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হবে।

নেপোলিয়ন ইতালীবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর ইতালীতে আগমণ। ইতালী—বাসীরা যেন ফরাসীদের তাঁদের শত্রু বলে মনে না করে। যারা উৎপীড়ক তাদের সঙ্গেই ফরাসীদের বিরোধ। সাধারণ লোকের সঙ্গে নয়। এ ভাবে নেপোলিয়ন ইতালীবাসীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নেপোলিয়নকে তারা তাদের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করল।

ইতালী অভিযানে এ সাফল্যে ফ্রান্সের আপামর জনসাধারণ নেপোলিয়নকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র রক্ষা পেল সত্য কিন্তু ডাইরেক্টরী সভা নেপোলিয়নের এ অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ডাইরেক্টরী সভার কেউ কেউ বললেন নপোলিয়নকে আর বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। আবার াইরেক্টরী সভার সদস্যগণ নেপোলিয়নের ক্ষমতা খর্ব করতেও সঙ্কিত।

কেন না ফ্রান্সের জনগণ তখন নেপোলিয়নের নামে মুগ্ধ। ডাইরেক্টরী সভা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যত উষ্মাই প্রকাশ করুক না কেন— ফরাসী জনমতের চাপে এ সভা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারল না। ফরাসী জনগণ ডাইরেক্টরী সভাকে স্পষ্টভাবে লিখিত স্মারকলিপিতে জানিয়ে দেন যে তারা এ যুদ্ধে সেনা নায়ককে ফরাসীদেশের সম্রাট পদে বসাতে চায়। তারা পরিষ্কার বলতে লাগল "We will drive away these lawyers and make the little corporal king" ফরাসী জনগণ বেশ বুঝতে পারল যে নেপোলিয়নই ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নবরূপে সুসজ্জিত করেছেন, ফ্রান্সকে চরম অর্থসঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে ফ্রাসের আভ্যন্তরীণ উন্নতির পথ করেছেন প্রশস্ত, ফ্রান্সের যাদুঘরগুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন চিত্র ও ভাস্কর্য মূর্তির দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে অসাধারণ ক্ষমতাবান ও চিন্তাশীল নেপোলিয়নই প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা।

ইতালী অভিযান সম্পন্ন করে নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে এলেন। মিশর অভিযানের পরিকল্পনা ছিল তাঁর মাথায়। ডাইরেকটরী সভায় তাঁর মিশর অভিযানের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। চাইলেন ডাইরেকটরী সভার মত। এমত অবস্থায় ডাইরেকটরী সভা নেপোলিয়নকে মিশরে পাঠাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না। বরঞ্চ তাঁকে মিশর অভিযানে প্রেরণ করতে পারলে ডাইরেকটরী সভা নিশ্চিন্ত হবে—দূরে সরে গেলে হয়ত ফরাসী জনগণ নেপোলিয়নের মোহ থেকে আস্তে আস্তে মুক্ত হতে পারবে। ডাইরেকটরী সভা আরও ভাবল মিশরের যুদ্ধে নেপোলিয়নের যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে— তারা সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। Abbott বলেছেন, "Most devoutly did they hope that from that distant land he would never return."

এ সময়ে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের মান-সম্মান, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির

ব্যাপারে এবং ফরাসী জনগণের মনে তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগাবার জন্য যোসেফাইনের কৃতিত্বও কোন অংশে কম ছিল না। যোসেফাইন নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় নেপোলিয়নের কৃতিত্বের কাহিনী সর্ব্ব সময়ে প্রচার করার জন্য একটি শক্তিশালী দল গঠন করেছিলেন। যোসেফাইন শুধু নেপোলিয়নের গুণাবলী প্রচার করে ক্ষান্ত হলেন না—নেপোলিয়নের শত্রুদের দমন করে কিভাবে নতুন সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার চেষ্টারও কসুর করলেন না।

নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্য সামন্ত রণতরী, কামান, গোলাবারুদ, রসদ প্রভৃতি যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম নিয়ে মিশর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। এ সময় নেপোলিয়নের মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে যোসেফাইন কেন এখনো সন্তানসম্ভবা হচ্ছেন না। মিশর অভিযানে যাত্রা করার আগে যোসেফাইনও নেপোলিয়নের সঙ্গে ছিল। যোসেফাইন নেপোলিয়নকে বিদায় জানাবার জন্য তুঁলো বন্দরে এসেছিলেন। ১৭৯৮ সালের, ১৯শে মে—নেপোলিয়ন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশর অভিযানে যাত্রা করেন। নেপোলিয়ন যে জাহাজে করে এ অভিযানে যাত্রা করেন—তার নাম 'লা ওরিয়েন্টা'। যোসেফাইন তুঁলোর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়নের রণতরী 'লা ওরিয়েন্টা'র গতি লক্ষ্য করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নেপোলিয়নের রণতরী তিনি নিরীক্ষণ করতে পারলেন ততক্ষণ তিনি তুঁলো বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে এ রণতরী তাঁর চক্ষুর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অত্যন্ত বিমর্ষ যোসেফাইন তাঁর প্রিয়তমকে বিদায় জানালেন। ফিরে এলেন স্বাস্থ্যকর স্থান প্লম্বিয়ার্সে। ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় যোসেফাইন এখানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক ফরাসী রমণী ছিল। তাঁর সাথী ও দুঃখ বেদনার সমব্যথী। একদিন যোসেফাইন তাঁর দ্বিতলের ঘরে বসে সূচী শিল্পের কাজে ব্যস্ত—এমন সময় একজন মহিলা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে

সকলকে ডেকে—নিচে একটি lap-dog কি সুন্দর ভাবে চলেছে তা দেখার জন্য বললেন। সকলেই হুড়মুড় করে বারান্দায় এল। পুরানো বারান্দাটি হঠাৎ ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেল। কেউ কেউ অল্পবিস্তর আঘাত পেল। কিন্তু যোসেফাইনের পা গেল ভেঙ্গে। এ ভাঙ্গা পা নিয়ে তাঁকে প্রায় দুমাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই যোসেফাইন চিরকালের জন্য তাঁর সন্তান ধারণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন—যা তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল অসহনীয় মানসিক দুঃখ। নেপোলিয়নের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

২৭শে জুলাই, ১৭৯৮ সনে নেপোলিয়ন কায়রো থেকে ভাই যোসেফকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির আসল বক্তব্য ছিল যোসেফ যেন প্যারিসের নিকট তাঁদের জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করে রাখেন। এ চিঠি যোসেফের হাতে এসে পৌছায়নি। কেন না মাঝখানে এ চিঠি এক ইংলিশ ক্রুইজারের হাতে এসে পড়ে। অবশ্য এ চিঠির খবর ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যোসেফাইন তা জানতে পেরে প্যারিস থেকে ছয় মাইল দূরে ম্যালমাইসনে ১,৬০,০০০ ফ্রাঙ্কস্ দিয়ে একটি সুন্দর বাড়ী ক্রয় করেন। যোসেফাইন তাঁর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী এই বাড়ীকে অপূর্বভাবে সাজাবার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়ন মিশর থেকে ফিরে এসে এ গৃহকে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় গৃহ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। পরে বিশ্বের নতুন নতুন চিত্রশিল্প ও মণিমুক্তা ইত্যাদি দিয়ে এ গৃহকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

নেপোলিয়ন যখন মিশর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন—সে সময় যোসেফাইনের নামে অনেক কুৎসা রটেছিল। যোসেফাইন নাকি সে সময় হিপ্পোলাইট নামক একজন সাধারণ সেনানায়কের সাথে সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতেন। নেপোলিয়নের চিঠির উত্তর দেওয়ারও তাঁর কোন ফুরসৎ ছিল না। নেপোলিয়ন এতে এতই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন যে, তিনি যোসেফাইনকে ত্যাগ করার কথাও চিন্তা করে রেখেছেন।

কিন্তু J. S. C. Abbott তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, নেপোলিয়ন ও প্যারিসের জনগণের উপর যোসেফাইনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি-যোসেফাইনের মেয়েবন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও যোসেফাইনের ওপর এজন্য বিশেষ রাগ ছিল। তাই তারা নেপোলিয়নের মনকে বিষাক্ত করার জন্য যোসেফাইন সম্পর্কে এ সমস্ত মিথ্যা রটনা করতেন।

এ সমস্ত চিঠি পত্র প্রথম প্রথম নেপোলিয়নের মনের ওপর বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। কিন্তু ক্রমশঃ কুৎসাসম্বলিত চিঠির সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষত ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন অনেকেই নেপোলিয়নের কানে যোসেফাইন সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দিতেও চেষ্টার কসুর করলেন না। মিশর অভিযানের এ সমস্ত রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতাদের কাছ থেকে নেপোলিয়ন যোসেফাইন সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা শুনতে শুনতে নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। যোসেফাইন সম্পর্কে সত্যি সত্যি তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, যোসেফাইন একজন কুলটা নারী। তাঁর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক তিনি রাখবেন না।

যোসেফাইনকে মিশর থেকে কঠোর ভাষায় তিনি চিঠি দিয়েছেন এবং যোসেফাইনকে যে তিনি এবার নিশ্চয় পরিত্যাগ করবেন এ সম্পর্কেও তিনি তাঁকে জানিয়ে দিতে ভুলেননি। যোসেফাইন চোখের জল ফেলেছেন। নেপোলিয়নের কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নেপোলিয়নের হাতে তাঁর সব চিঠিপত্র গিয়ে পৌঁছায়নি।

ওথেলোর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য ইয়াগোই ছিল দায়ী। যার জন্য ওথেলো ডেস্ডিমোনাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতেও পিছপা হন নি। অথচ ডেস্ডিমোনার কোন দোষ ছিল না। ওথেলোকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু তাঁর শোচনীয় পরিণতির মূলে ছিল ইয়াগো। Abbottও তাই বলেছেন ইয়াগোর দল যুগে যুগে এরকম

কত নিরপরাধ নারীর জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

প্রায় বহুকাল যাবৎ ফ্রান্স ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধের কোন খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। যোসেফাইনও নেপোলিয়নের কোন চিঠিপত্র পাচ্ছিলেন না। ফলে তিনি নেপোলিয়নের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময় একবার গুজব রটে গেল যে নেপোলিয়নের মৃত্যু ঘটেছে।

১৭৯৯ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ডাইরেক্টরী সভার অধিবেশন চলছে এমন সময় টেলিগ্রামে খবর এলো—নেপোলিয়ন উক্ত দিনে ফ্রেজাস (freus) এ উপস্থিত হয়েছেন। যোসেফাইন খবর পেয়ে কন্যা হরতেনস ও ল্যুই বোনাপার্টকে নিয়ে অশ্বশকটে করে বার্গাণ্ডির পথে রওনা হলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। নেপোলিয়ন বহুদিন আগে অন্য পথ ধরে প্যারিস অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন।

যোসেফাইনের মনে নানান কথার উদয় হতে লাগল। তিনি ভাবলেন নেপোলিয়নের হয়ত মৃত্যু ঘটেছে—দুশ্চিন্তায় যোসেফাইন জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি আবার প্যারিসের পথে যাত্রা করলেন। প্যারিসে এসে যোসেফাইন নেপোলিয়নের সঙ্গে মিলিত হলেন। এতে তাঁর দুদিন সময় নষ্ট হল।

নেপোলিয়ন তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা। এ দুদিন যোসেফাইনের অদর্শনে তাঁর ওপর নেপোলিয়নের সন্দেহ আরও গাঢ় হল যে যোসেফাইন সত্যি সত্যি তাঁকে পছন্দ করেন না। তাই তিনি বার বার বলতে লাগলেন যোসেফাইনের সাথে তাঁর এবার "Open and public divorce" অবধারিত।

এমন সময় যে ঘরে বসে নেপোলিয়ন যোসেফের সাথে কথা বললেন সে ঘরে এসে যোসেফাইন হাজির হলেন। প্রায় দেড় বৎসর পর যোসেফাইনকে দেখে নেপোলিয়নের মনে ভালবাসার উদ্রেক হলো না। তারস্বরে যোসেফাইনকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন এ মুহূর্তে

যোসেফাইন যেন প্যারিস পরিত্যাগ করে চলে যান।

যোসেফাইনের উত্তর দেওয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না—কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রিয়তম স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নেপোলিয়ন ইউজিনকে ডেকে বলে দিলেন সে যেন তার মাকে নিয়ে সেখান থেকে ঐ রাতের জন্য অন্যত্র চলে যায়। নেপোলিয়ন যোসেফাইনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ করলেন।

যোসেফাইন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যোসেফাইন দুদিন পাশের ঘরে কাটালেন। দুদিন পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন যোসেফাইনের কোন খবর নিলেন না। তৃতীয় দিনে অন্তরের গভীর বেদনায় নেপোলিয়ন যোসেফাইনের ঘরে এলেন। গম্ভীর কণ্ঠে যোসেফাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি মিশর থেকে তাঁকে প্রচুর চিঠি দিয়েছেন—কিন্তু কোন উত্তর পাননি। তার কারণ কি?

যোসেফাইন কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। শুধু বীর স্বামীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কি করুণ তাঁর চাহনি? যেন প্রভুর চরণে আত্মাহুতি দেবার জন্য আকুল হয়ে আছেন। প্রিয়তমকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন তাঁর দুটি অশ্রুপূর্ণ আঁখি। আর ভাবছেন, বিধাতা তাঁকে কি করতে চলেছেন। নেপোলিয়ন বিগলিত তাঁর দক্ষিণ হস্ত যোসেফাইনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। যোসেফাইন তাঁর হাত ধরে অবনত মস্তকে স্বামীর পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন। নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে ও দুঃখে দুজনের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হতে লাগল।

এরপর থেকে নেপোলিয়ন তাঁকে আর কোনদিন সন্দেহের চোখে দেখেননি। উষ্ণ ভালবাসা যোসেফাইনকে তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দিয়ে গেছেন—যা আর কোন রমণীর ভাগ্যে নেপোলিয়নের কাছ থেকে জোটেনি। অবশ্য যোসেফাইনের মৃত্যুর পর তিনি আরও ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এ সময় ডাইরেক্টরী সভার অপদার্থতাই ফ্রান্সে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ডাইরেক্টরগণ অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। তাদের বৈদেশিক নীতি দেশবাসী মেনে নিতে পারল না। ১৭৯৯ সালের নভেম্বর মাসে নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী সভা ভেঙ্গে দিলেন। সিইয়েস, ডুকোস ও নেপোলিয়নকে নিয়ে "কনসালেট" গঠিত হল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রথম কনসাল নিযুক্ত হলেন। প্রকৃত পক্ষে নেপোলিয়নই এখন থেকে ফ্রান্সের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিলেন। ১৭৯৯—১৮০৪ পর্যন্ত কনসালটের শাসনকার্য চলেছিল ফ্রান্সে।

কনসালটের শাসনকালে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য যা করে গেছেন তার বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ইয়োরোপের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য তিনি যা করে গেছেন—তা বিশ্ব ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণীকে তিনি বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। জার্মানী ও ইতালীর ঐক্য বন্ধনের জন্য নেপোলিয়নের কাছে বিসমার্ক ও কাভুর ঋণী। এটা ইতিহাস কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। জার্মানী, ইতালী, মিশর তুরস্ক ইত্যাদি দেশের শোষিত জনগণের যে হিতসাধন তিনি করে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতালীর জনতা নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে 'সি পি ও' 'হ্যানিবেল' 'জুপিটার' আর 'প্রমেথেউস' এর সাথে তুলনা করেছে। তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে, "বেঁচে থাকুন সর্বপরিত্রাতা নেপোলিয়ন। আমাদের মত গরীবদের তিনি মা বাপ"।

নেপোলিয়ন এ সময়ে ফ্রান্সের নানান ব্যাপারে ভীষণ ভাবে ব্যস্ত। প্রথম কনসালরূপে বস্তুত সমস্ত দেশের কর্তৃত্বভার তাঁর ওপর বর্তাল। নেপোলিয়নের শত্রুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। তিনি সবই বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন শত্রুদের দমন করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। রাজতন্ত্রীরাই এখন নেপোলিয়নের প্রবল শত্রু। তারা নেপোলিয়নকে হত্যার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হলো। কেন না নেপোলিয়ন

জীবিত থাকলে ফ্রান্সে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চিরকালের জন্য লুপ্ত হবে।

প্রথম কনসাল নিযুক্ত হবার ছমাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন (তুইলারির) রাজপ্রাসাদ দখল করে নিলেন। তুইলারির রাজপ্রাসাদের যোসেফাইনের জন্য যে গৃহটি রাখা হলো তা আগে ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞীরাই ব্যবহার করতেন। বারজন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের সে সময় কনসালের প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

যোসেফাইনের জীবনী লেখক ডঃ মাইনস্ বলেছেন যে, যোসেফাইন এ সময় অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আততায়ীর হাতে নেপোলিয়নের প্রাণ নাশ ঘটতে পারে এটাই ছিল তাঁর ভীতির প্রধান কারণ।

নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে নিয়ে এ সময় কিছুদিন ম্যালমাইসনে চলে যান। 'তুইলারির' রাজপ্রাসাদে অগণিত লোক সমাগমে নেপোলিয়ন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। প্যারিসের তুইলারির প্রাসাদ থেকে ম্যালমাইসনের দূরত্ব ছয় মাইল। আগেই উল্লেখিত হয়েছে ম্যালমাইসনে যোসেফাইন নিজের অর্থে একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেছিলেন যেটা দেখতে রাজপ্রাসাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ম্যালমাইসন থেকে নেপোলিয়নকে এ পথ অতিক্রম করে তুইলারির প্রাসাদে আসতে হতো। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমর্থকরা তলে তলে নেপোলিয়নকে মারার সব ষড়যন্ত্র পাকা করে ফেলেছে। তাই নেপোলিয়ন রওনা হবার আগে যোসেফাইন একটি বিরাট রক্ষী বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে রাখতেন।

একদিন হঠাৎ শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণে যোসেফাইন অল্প বিস্তর আহত হন। যোসেফাইন আরও ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন এর পর হয়ত আরও বড় বিপদ আসতে পারে। স্বামীকে বাঁচানো যাবে না এ ভেবে যোসেফাইন চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। নেপোলিয়ন আর নীরব থাকলেন না। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করলেন।

অনেককে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দলের নেতা Dukd.' Eughien কে বন্দী করে হত্যা করলেন। তার পর থেকে আর কোনদিন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এরকম ষড়যন্ত্র হয়নি।

১৮০০ সালের বসন্তকালে নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার ইতালী অভিযানে যাত্রা করেন। মাত্র দু'মাস সময়ের মধ্যে সমগ্র ইতালী বস্তুত পক্ষে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ২রা জুলাই, ১৮০০—নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনকে তুইলারির রাজপ্রসাদে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে প্যারিসের জনগণ। এ সময় যোসেফাইন ৩৭ বৎসরে পদার্পণ করেছেন, আর নেপোলিয়নের বয়স তখন ৩১। কিন্তু তখনো যোসেফাইনের রূপ-লাবণ্য এত অধিক ছিল যে তাঁকে দেখে কেউ ষোড়শী বা অষ্টাদশী যুবতী ভিন্ন অন্য বয়সের নারী বলে মনে করতে পারতো না।

এরপর ম্যালমাইসনে বেশ কিছুদিন নেপোলিয়ন ও যোসেফাইন আনন্দেই কাটিয়েছেন। সেখানে যোসেফাইন পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেন্স আর যোসেফাইনের দুইজন পর্তুগীজ বান্ধবীও থাকতো।

হরতেন্সকে যোসেফাইন অত্যন্ত স্নেহ করতেন—এমন স্নেহ ও ভালবাসা খুব কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে মায়ের কাছ থেকে। বিশেষত মায়ের দ্বিতীয়বার পানিগ্রহণের পর। হরতেন্স ছিলেন বিদ্যাশিক্ষার দিকে আগ্রহশীল এবং তাঁর মেধাও ছিল অস্বাভাবিক। মা যোসেফাইনের কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে হরতেন্স নিজের চরিত্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হরতেন্স এর সাথে নেপোলিয়নের ছোট ভাই ল্যুই বোনাপার্টের বিয়েতে যোসেফাইন নীরব দর্শক ছিলেন। যোসেফাইনের এ বিয়েতে যে সম্মতি ছিল—এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। নেপোলিয়নের ইচ্ছাতেই বিয়ে হলো। কিন্তু বিয়ের পরিণতি খুব সুখকর হয় নি। যোসেফাইন অবশ্য মেয়েকে সৎ উপদেশ দিয়ে মেয়েকে নিষ্ঠাবতী ও আদর্শবতী নারী হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বদাই চেষ্টা করতেন।

যোসেফাইন তখন ফ্রান্সের বহুল প্রশংসিত নাম। ফ্রান্সের জনগণ যোসেফাইনের মিষ্টি মধুর ব্যবহারে বিগলিত। তাঁর সন্দর্শনে তাদের মন যুগপৎ আনন্দ ও আশার আলোতে উদ্ভাসিত হতো।

একদিন্ নোপোলিয়ন তাঁর কক্ষে বসে কর্মরত। সে সময় যোসে-ফাইনও কি একটা কাজে নেপোলিয়নের কাছে ছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেপোলিয়নের দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। নেপোলিয়নের নির্দেশে তিনি ভেতরে এলেন—কিন্তু নেপোলিয়নকে দেখে কিছুই বলতে পারছিলেন না। যোসেফাইন ভদ্রলোককে তাঁর আসার হেতু কি এবং তিনি কে ? এ সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বৃদ্ধ জানালেন যে তিনি এক সময়ে নেপোলিয়নের শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর কাছেই নেপোলিয়নের বিদ্যাশিক্ষার হাতে খড়ি। তিনি সম্রাটের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থী। নেপোলিয়ন তখন রসিকতাচ্ছলে শিক্ষক মহাশয়কে জানালেন আজ তাঁর শিক্ষকতাগুণে নেপোলিয়নের হস্তাক্ষর এরূপ সুন্দর হয়েছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েই আছেন। যোসেফাইনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নেপোলিয়ন ভদ্রলোককে বললেন এই ভদ্র-মহিলাকেই জিজ্ঞেস করুন তাঁর হস্তাক্ষর সম্পর্কে।

যোসেফাইন বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তাঁর শিক্ষাগুণে তাঁর স্বামীর হস্তাক্ষর আজ সত্যি এত সুন্দর হয়েছে। বৃদ্ধ হালে পানি পেলেন। যোসেফাইন নেপোলিয়নকে দিয়ে বৃদ্ধের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ যোসেফাইনকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

বাস্তবিক পক্ষে নেপোলিয়নের হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত খারাপ। পড়া দুঃসাধ্য ছিল। লেখাগুলি যেন মানচিত্রের আকার ধারণ করত। একদিন যোসেফাইন নেপোলিয়নের চিঠি পড়ছেন—সে সময় এক মহিলা এসে হাজির। তিনি চোখে একটু কম দেখতে পেতেন। যোসেফাইনকে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোন ভূগোলের মানচিত্র দেখছেন কিনা ? এ রকম ছিল নেপোলিয়নের হস্তাক্ষর।

অ্যামিয়েন্সের সন্ধিতে প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের কাছে ইংল্যাণ্ডকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল। ইয়োরোপ ও ইয়োরোপের বাইরে ফ্রান্স অধিকৃত জায়গার ওপর ফ্রান্সের অধিকার ইংল্যাণ্ড মেনে নিতে বাধ্য হল। ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধজন নেপোলিয়নের পরাক্রমের পরিচয় পেলেন। বিস্মিত হলেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা আশা পোষণ করতে লাগলেন।

ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ ফরাসীদের বানরের জাত বলে উল্লেখ করত। এখন বুঝতে পেরেছে এরা রক্তের স্বাদ পেয়ে ব্যাঘ্রে পরিণত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সুধী সমাজ নেপোলিয়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সুধী সমাজের প্রথমসারির যে সমস্ত নেতা নেপোলিয়নের প্রশংসা করতেন—তাঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ চার্লস জেমস ফক্সই অন্যতম।

নেপোলিয়ন ও যোসেফাইন মিঃ ফক্সকে প্যারিসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ফক্সের ফরাসীপ্রীতি, তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর অপূর্ব ব্যবহার নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনকে মুগ্ধ করেছিল। ফক্স কিছুদিন নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের সঙ্গে ম্যালমাইসনেও কাটালেন। বিশ্বের দুজন চিন্তানায়ক ফক্স ও নেপোলিয়নের মধ্যে আলোচনা হল। দুজনের চিন্তাধারা দুজনকেই যুগপৎ বিস্মিত ও হতবাক করেছিল। ফক্সের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারে নেপোলিয়ন এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নেপোলিয়ন ফক্স সমন্ধে বলতে দ্বিধা করেননি যে—"Fox is a Greatman."

নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের দিন বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটছিল। নোপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের স্থায়ী কন্সাল নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবে সেটা ঠিক করার দায়িত্বও নেপোলিয়নের হাতেই অর্পিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই ফ্রান্সের পরিবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবে এটা নিয়ে ফরাসী জনগণের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হয়। কেন না নেপোলিয়নের ঔরসে যোসে-

ফাইনের আর কোন পুত্রসন্তান হওয়ার আশা ছিল না। তাই ফরাসী জনগণ আকারে ইঙ্গিতে নেপোলিয়নকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, নেপোলিয়নের আবার দার পরিগ্রহ করা উচিত।

যোসেফাইন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী হতে চাননি এবং নেপোলিয়ন যাতে ফরাসী সম্রাটরূপে ফ্রান্সের রাজমুকুট নিজ মাথায় ধারন না করেন সে ব্যাপারে যোসেফাইন চেষ্টার কসুর করেন নি। কেন না যোসে—ফাইন ফ্রান্সের জনগণের মনের অবস্থা জানতেন এবং জানতেন যে, নেপোলিয়নের ঔরসে তাঁর গর্ভে কোন ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং নেপোলিয়ন সম্রাটপদে অভিষিক্ত হলে যোসেফাইনকে নোপোলিয়ন পরিত্যাগ করে অন্য নারীর পানিগ্রহণ করতে বাধ্য হবেন—দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে। সে সময় যোসে-ফাইনের কি অবস্থা হবে? তা ভেবে যোসেফাইন চিন্তাক্লিষ্ট।

নেপোলিয়ন আজীবন কন্সাল পদে থাকুন এটা চাইতেন যোসে—ফাইন। কিন্তু তাত হওয়ার নয়। ফ্রান্সের প্রয়োজনে নেপোলিয়নকে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হতে হলো। পোপ সপ্তম পায়াস প্যারিসের গীর্জায় নেপোলিয়নের অভিষেক সম্পাদন করলেন। নেপোলিয়ন পোপের হাত থেকে ফ্রান্সের রাজমুকুট গ্রহণ করে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। ফ্রান্সের সমস্ত ক্ষমতা তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। যোসেফাইন এখন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞী হয়েও যেসেফাইনের চিন্তার শেষ নেই। ফরাসী জনগণের মনের কথা তাঁর অজানা নয়। তারা নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী চায়।

দিন যায় এরমধ্যে নেপোলিয়ন, যোসেফাইন পুত্র ইউজিনকে ব্যাভেরিয়ার রাজকন্যার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। হরতেন্সকে বিয়ে দিয়েছেন নিজের ভাই ল্যুই বোনপার্টের সাথে। এ সমস্ত ব্যাপারে নেপোলিয়ন যোসেফাইনের মতের অপেক্ষা রাখেনি যদিও বা যোসেফাইন মনে মনে চাইতেন নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী হউক তাঁর পুত্র ইউজিন। কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে বা ফ্রান্সের জনগণের

পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কেন না যেখানে তাঁর রক্তের সম্পর্কের ভাইরা রয়েছে, সেখানে নেপোলিয়নের পক্ষে যোসেফাইনের ছেলেকে তাঁর উত্তরাধিকারী করার চিন্তা করা বৃথা।

হরতেন্সকে ল্যুই বোনাপার্ট বিয়ে করেছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে ১৮০৭ সালে হরতেনসের প্রথম পুত্র মাত্র পাঁচবৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে নেপোলিয়নের ভাইয়ের ছেলেকে ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার চিন্তারও কোন সুযোগ রইল না। বলেছেন, "Had the first son of Hortense lived, there can be little doubt that he would have been selected as the heir of the empire."

পুত্রশোকে হরতেন্স কাতর, যোসেফাইনও ততোধিক। একদিকে নাতির মৃত্যুশোক অন্যদিকে উত্তরাধিকারীর চিন্তায় যোসেফাইন ব্যাকুল। তাঁর জীবনের অন্তিম পরিণতি কি—সে সমন্ধে এখন তাঁর আর জানতে বাকী রইল না।

নেপোলিয়ন বিশেষ দুটি কারণে পুনরায় তাঁর বিয়ের কথা চিন্তা করেছিলেন। প্রথমত তিনি বুঝতে পারছিলেন ইয়োরোপের সমস্ত রাজন্যবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুতরাং কোন প্রতাপশালী সম্রাটের কন্যা বা বোনকে বিয়ে করতে পারলে—সেই সূত্রে সে সম্রাটের সাথে তাঁর একটি মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠবে—ফলে ইয়োরোপে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার কোন অসুবিধে হবে না। দ্বিতীয়ত তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর ঔরসজাত সন্তান ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে—এতে দেশের প্রজাপুঞ্জের মনে সন্তুষ্টি আসবে।

ওয়ারগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভের পর নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে এলেন। এ যুদ্ধে যাওয়ার আগে নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে দ্বিতীয়-বারের জন্য রিজেন্ট করে যান।

ওয়ারগ্রামের যুদ্ধ শেষ করে নেপোলিয়ন ও যোসেফাইন 'ফন্টেন্ব্লু'র রাজপ্রসাদে বাস করতে লাগলেন। এ সময় থেকে সম্রাটের সাথে

যোসেফাইনের সম্পর্কের চিড় ধরতে আরম্ভ করে। সম্রাটের সাথে যোসেফাইনের অবাধ মেলামেশার পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হতে চলেছে। সম্রাট যোসেফাইনকে ত্যাগ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এতদিনেও যখন যোসেফাইনের গর্ভে সন্তান এলো না তখন সম্রাটের পক্ষে নতুন করে দারপরিগ্রহ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

কিন্তু সম্রাট অন্তর্দহনে দগ্ধ হচ্ছেন। সে দহন যন্ত্রণা প্রকাশ করার ভাষা সম্রাট হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু ভাবছেন বিনা দোষে, বিনা অপরাধে—তাঁর এতদিনের আপদ-বিপদের মরমী সাথী প্রিয়তমা যোসেফাইনকে তিনি পরিত্যাগ করতে চলেছেন। যোসেফাইনকে তিনি অনেকভাবে এ ব্যাপারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। যোসেফাইন যেন বোঝেও বোঝেনা।

নেপোলিয়ন এখন থেকে লাইব্রেরীতে অধিক সময় কাটান, কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকেন, যোসেফাইনের সাথে তাঁর সে মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হতে চলেছে। যোসেফাইন সম্রাটের মনের অন্তর্যাতনা ভালই উপলব্ধি করতে পারছেন।

যোসেফাইন বুঝতে পারলেন সম্রাটের সাথে তাঁর বিচ্ছেদের দিন আগতপ্রায়। তিনি যোসেফাইনের বাসের জন্য প্যারিস নগরীতে একটি এবং গ্রামাঞ্চলে একটি—সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর জন্য বার্ষিক ৩০ লক্ষ মুদ্রা ভাতা হিসাবে দেবার ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেল। হায় বিধাতা যে একদিন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী ছিলেন—যাঁর অঙ্গুলী হেলনে দেশের সম্রাট পর্যন্ত চালিত হতো—আজ তিনি কোথায় চলেছেন? যিনি এতদিন ছায়ার মত সম্রাটকে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে অনুসরণ করেছেন সম্রাট আজ নিজের স্বার্থে, কুতর্কের ছলনায়, প্রজাপুঞ্জের কুপরামর্শে সব ভুলে গেছেন—যোসেফাইন এ সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

অবশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের, ৩০শে নভেম্বর নেপোলিয়ন তাঁর সংকল্পের কথা যোসেফাইনকে জানালেন। যোসেফাইন অবশ্য সবই

বুঝেছিলেন—শুধু সম্রাটের মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। কন্টেনবুর প্রাসাদের আনন্দ যেন একমুহূর্তে তিরোহিত হল, পরিষদ-বর্গের উচ্ছ্বাস, প্রাসাদের নৃত্যগীতির অনুষ্ঠান বন্ধ হলো, প্রাসাদ শ্রীভ্রষ্ট হলো। শোকাতুরা রমণীর ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

নেপোলিয়ন চিন্তাক্লিষ্ট। অন্তর্দহনে তিনি পলে পলে দগ্ধ হচ্ছেন। যোসেফাইনের সাথে কথা বলার সাহসও হারিয়ে ফেলেছেন। সেদিন দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলেন। খাবার টেবিলে ভৃত্য এসে দিয়ে গেল খাবার। খাবার টেবিলে দুজনের কোন গল্পগুজব নেই, নেপোলিয়নের রসিকতা নেই—চুপচাপ দুজন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় পাশাপাশি বসে খাবার সাঙ্গ করে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

নেপোলিয়ন থাকেন আপন মনে, মন্ত্রণাপরিষদ নিয়ে, কাজকর্ম নিয়ে, পড়াশুনা নিয়ে। যোসেফাইন ভেবে কূল পান না কি অপরাধে তিনি স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হতে চলেছেন।

নেপোলিয়ন একদিন কম্পিত দেহে যোসেফাইনের কাছে যান। যেসোফাইনকে জড়িয়ে ধরে গম্ভীর অথচ করুণ কণ্ঠে বললেন যে তিনি যোসেফাইনকে কতই না ভালবেসেছেন, একমাত্র যোসেফাইনের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন তাঁর উচ্চাকাঙ্খা পরিপূরণের পাথেয়। যোসেফাইনের নিষ্কলুষ প্রেমে তাঁর হৃদয় গেছে ভরে, তাঁর বিপদ আপদের সাথী যোসেফাইনকে আজ তিনি ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন—ফ্রান্সের জনগণের চাপে, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর চিন্তায়। তিনি যোসেফাইনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে যোসেফাইন ত জানেন তাঁর প্রাণ ব্যাপী স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা—ফ্রান্সের মঙ্গলের কাছে তুচ্ছ সামগ্রী। নেপোলিয়ন বললেন, "Josephine my destiny overmasters my will, my dearest affections must be silent before the interest of France."

যোসেফাইন নেপোলিয়নের কথা আর শুনতে পারলেন না। তাঁর

চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মূর্ছিত হয়ে সহসা ভূতলে পতিত হলেন। কতক্ষণ পরে যে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। নেপোলিয়ন দুজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এলেও কিছু করতে পারলেন না। কন্যা হরতেন্স ও নেপোলিয়ন যোসেফাইনের পাশে বসে ছিলেন। ডাক্তার প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র দিলেন। তাতেও জ্ঞান ফিরতে প্রায় রাতের শেষ প্রহর লেগে গেল। যোসেফাইনের জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন স্বামী পাশে বসা। নেপোলিয়নকে দেখে যোসেফাইন চীৎকার করে বলে উঠলেন, "না—না তুমি ইহা করিতে পারিবে না, আমাকে তুমি বধ করিও না।"

তারপর যোসেফাইন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ফ্রান্সের স্বার্থে তিনি কোন্ সম্রাটের কন্যা বা আত্মীয়াকে বিয়ে করতে চলেছেন? সে সম্রাটটি কে? ফ্রান্সের শত্রু অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা যে ফ্রান্সকে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। যে ফ্রান্সকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার চোখে দেখে। যে অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে নেপোলিয়ন এত বিরূপ, যার সম্পর্কে নেপোলিয়ন বহুবার যোসেফাইনকে বলেছেন, যে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে তিনি এতদিন সংগ্রামেরত ছিলেন—সেই অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যাকে তিনি কি এখন বিয়ে করতে চলেছেন? সম্রাট কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

নেপোলিয়নের আহবানে ইউজিন ইতালী থেকে প্যারিসে চলে এলেন। ভগ্নী হরতেনস্ ইউজিনকে সবিস্তারে সব বললেন। ইউজিন মায়ের সাথে কথা বলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারলেন না। সম্রাটের কাছে গেলেন ইউজিন। তিনি সম্রাটকে যোসেফাইনকে পরিত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নেপোলিয়ন ইউজিনকে সমস্ত কিছু খুলে বললেন। ইউজিন তাতে আশ্বস্ত হলেন না। সম্রাটকে বললেন তাঁকে যেন তাঁর কর্মত্যাগ করার অনুমতি দেন। তিনি সম্রাটের কোন কাজে থাকতে চান না। নেপোলিয়ন অন্তর্যাতনায় কাতর। ইউজিনকে ডেকে বুকে নিলেন। কাতর কণ্ঠে বললেন তিনি ইউজিনকে কত স্নেহ

করেন এবং তাঁর বোন হরতেন্‌সের সার্বিক মঙ্গলের জন্ত তিনি কি না করেছেন? ইউজিনের ও বোঝা উচিত ফ্রান্সের প্রয়োজনে তিনি তাঁর মাকে ত্যাগ করে নতুন দারপরিগ্রহ করতে চাইছেন।

ইউজিন যদি নেপোলিয়নকে ত্যাগ করে তা হলে তাঁর কি অবস্থা হবে? তাঁর উপর এত দায়িত্বভার সম্রাট অর্পণ করেছেন, যিনি এতদিন সম্রাটকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছেন, যাঁকে সম্রাট তাঁর পুত্রবৎ স্নেহ করেন—তাঁর কাছ থেকে এ বিচ্ছেদ বেদনা সম্রাট সইতে পারবেন না। সম্রাট ইউজিনকে জানিয়ে দিলেন, সম্রাটের যদি ভবিষ্যতে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা ও সার্বিক উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ইউজিনকেই নিতে হবে। সম্রাট তাই ইউজিনকে কাতর স্বরে বললেন তিনি যেন সম্রাটকে এ অবস্থায় পরিত্যাগ না করেন।

ইউজিন সম্রাটের মনের কথা বুঝতে পারলেন। সম্রাটের পাশে বসে অনেকক্ষণ নানান ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ইউজিন অনুভব করতে পারলেন সম্রাটের অন্তর্বেদনা। ভাবলেন সম্রাটের জন্যইত আজ তাঁর এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি। তাঁদের জীবনের অন্তিম লগ্নে নেপোলিয়ন এসে না পড়লে তাঁদের পক্ষে ত এ সুদিনের মুখ দেখা সম্ভব হত না।

যোসেফাইনও ইউজিনকে ডেকে অনেক বোঝালেন। ইউজিনকে বললেন যোসেফাইনের সাথে সম্রাটের বিচ্ছেদ ঘটলেও ইউজিন যেন সম্রাটকে ত্যাগ না করে। কেননা সম্রাটের অনুগ্রহেইত আজ ইউজিনের এ শ্রীবৃদ্ধি। তদুপরি সম্রাট যখন তাঁর ওপর অত নির্ভরশীল। এ সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে যোসেফাইনের মহত্বের তুলনা মেলা ভার।

অবশেষে তুইলারির প্রাসাদে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর নেপোলিয়নের সঙ্গে যোসেফাইনের আইন সঙ্গতভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হল। যোসেফাইন শোকাতুরা। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে—সাদা শাড়ি পরিধানে যোসেফাইনকে দেবীপ্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। এক মুহূর্তে যোসেফাইনের জীবনের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসা জীবনের শ্রেষ্ঠ

অবলম্বন সব তিরোহিত হল। যোসেফাইন শপথ বাক্য পাঠ করলেন। নেপোলিয়নের প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রয়োজনীয় জায়গায় সই-সাবুদ দিলেন। কি করুণ দৃশ্য তা ভাষায় বর্ণনা করা দুরূহ।

যোসেফাইনের কাতরতা উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করল। হরতেন্স ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারাক্ষণ কাঁদলেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। বীর যোদ্ধা ইউজিন দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। ইউজিন আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। হরতেন্স তাঁকে ধরে ফেললেন। হরতেন্স পরিচারিকাদের সাহায্যে ইউজিনের চৈতন্যহীন দেহ তুলে নিয়ে মায়ের সাথে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। শোকের এরকম হৃদয় বিদারক দৃশ্য কাব্য ও উপন্যাসে খুব বেশী পাওয়া যাবে না।

যোসেফাইন নিজ কক্ষে এসে কাঁদতে লাগলেন। পাশে হরতেন্স পুত্র ইউজিনের সেবায় রত। পরিচারিকাগণকে যোসেফাইন তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ক্রমে রাত গভীর হল। যোসেফাইন ধীরে ধীরে এক গোপন পথে নেপোলিয়নের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

উন্মাদিনীপ্রায় উদভ্রান্তা যোসেফাইন কাঁদতে কাঁদতে সম্রাটের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী নেপোলিয়নকে ধরে অঝোরে কাঁদলেন। দুজনের মনের মধ্যে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হতে লাগল। নেপোলিয়নের হৃদয় বিদারিত হতে লাগল। প্রিয়তমাকে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করলেন।

অনেকক্ষণ এভাবে কাটল। যোসেফাইনের সম্বিৎ ফিরে এলো। বুঝতে পারলেন তিনি একি করছেন। প্রেমের গৌরব, ঐশ্বর্যের গৌরব সম্মানের গৌরব—সব বিসর্জন দিয়ে এক মুহূর্তে নেপোলিয়নের কক্ষ ত্যাগ করে যোসেফাইন চলে গেলেন নিজের ঘরে। সম্রাট একাকী। অন্তরের তীব্রদহনে তিনি সেই রাত বিনিদ্র ভাবেই কাটালেন।

পরদিন সকাল ১১টায় যোসেফাইন তুইলারির রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ম্যালমাইসনের সুসজ্জিত গৃহে চলে গেলেন। তখনো কিন্তু

যোসেফাইন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী নামেই অভিহিত হতেন। অবশ্য এরপর আর কোনদিন তিনি তুইলারির রাজপ্রাসাদে আসেননি। নেপোলিয়ন কিছুদিন একাকী কাটালেন। সময় সময় অন্তরেরটানে তিনি ম্যালমাইসনে গিয়ে যোসেফাইনের সাথে দেখা করতেন।

নেপোলিয়ন যোসেফাইনের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। যোসেফাইন নিজের মনের মত ম্যালমাইসনের গৃহকে সাজালেন। সজ্জিত করলেন রাস্তাঘাট। তৈরী করলেন গৃহের কাছেই প্রকৃতির কোলে একটি সুন্দর বন। সেখানে যোসেফাইন গিয়ে দিনের বেলায় বেশ কিছু সময় কাটাতেন। সেখানে পাখির কলরব, সবুজের সমারোহ, সুশীতল ছায়া তাঁর মনের সতেজতাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করত। নেপোলিয়নের নির্দেশে ম্যালমাইসনের গৃহ সুসজ্জিত করার জন্য ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পাঠনো হল। তাঁদের দিয়েই যোসেফাইন তাঁর গৃহ সুসজ্জিত করল। আস্তে আস্তে তাঁর অন্তর্বেদনা খানিকটা তিরোহিত হল। তাঁর গৃহে এখন ফ্রান্সের গণ্যমান্য, রুচিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আনাগোনা আরম্ভ হল। এর পরে নেপোলিয়নের কাছ থেকে যোসেফাইন যে সমস্ত চিঠি পেয়েছেন সেগুলির মর্ম উদঘাটন করলে দেখা যাবে যে যোসেফাইন এখনো কত গভীরভাবে নেপোলিয়নের প্রেমডোরে বাঁধা রয়েছেন। এখন ত তিনি আর নেপোলিয়নের অধাঙ্গিনী নন। তাঁর একজন মরমী সাথী।

এরপর সম্রাট তাঁর মহীষীপদে কাকে বরণ করবেন তা স্থির করার জন্য ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তুইলারীর প্রাসাদে এক দরবার বসালেন। দরবারে সম্রাট পরিষদবর্গের মত যাচাই করলেন। নেপোলিয়ন তখন অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইসা বা রুশ সম্রাটের বোনের সাথে তাঁর বিয়ের কথায় ভাবছিলেন। কেউ কেউ অষ্ট্রীয়ার রাজকুমারীর পক্ষেই মত দিলেন। নেপোলিয়ন রুশ সম্রাটের কাছেও তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু রুশ সম্রাট ইতস্ততঃ করায় তিনি অষ্ট্রীয়ার রাজকুমারী লুইসাকে বিয়ে করার সংকল্প করলেন

এবং পরিষদবর্গকেও তাই জানিয়ে দিলেন। প্রস্তাব পাঠানো হলে অষ্ট্রীয় সম্রাট তা সানন্দে গ্রহণ করলেন।

ভিয়েনাতে নেপালিয়ন ও মেরিয়া লুইসার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল। ফ্রান্সে নতুন করে কোন বিয়ের প্রয়োজন ছিল না—তথাপি সম্রাট মোরিয়া লুইসাকে ফরাসী মতে বিবাহ করলেন। রাজ্যমধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল।

১লা এপ্রিল সেণ্ট ক্লাউডের প্রাসাদে মেরিয়া লুইসার সাথে নেপোলিয়নের আইন সঙ্গতভাবে বিয়ে হল। বিয়ের শেষে নেপোলিয়ন অনেক রাজ-কর্মচারী, পরিষদবর্গ, সেনাপতি, সৈনিকবৃন্দ, ফ্রান্সের বিদগ্ধজন ও শতাধিক শকটে পরিবৃত হয়ে প্যারি নগরীতে প্রবেশ করলেন। প্যারিসের নরনারী আনন্দে মেতে উঠলো, চারিদিকে উৎসবের সানাই বেজে উঠলো। মহোৎসবের হলো সূচনা। সকলের মুখেই হাসি, উচ্ছলতা, প্রাণের আবেগে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

প্যারিস থেকে ম্যালমাইসনের দূরত্ব মাত্র ৬ মাইল। নেপোলিয়ন কিছুদিনের জন্য যোসেফাইনকে ম্যালমাইসন থেকে নাভেরির প্রাসাদে স্থানান্তরিত করলেন—যাতে এসমস্ত আনন্দ উৎসবের সংবাদ যোসেফাইনের কাছে না পৌঁছায়। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন যোসেফাইন এ সমস্ত আনন্দ উৎসব চাক্ষুষ দেখলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারবেন না। তাঁর মনে হয়তো গুরুতর আঘাত লাগবে। যা হবে তাঁর মৃত্যুতুল্য।

এরপর নেপোলিয়ন নববধূ মেরিয়া লুইসাকে নিয়ে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ সন্দর্শনে গমন করেন। সমস্ত ফ্রান্স আনন্দ-কোলাহলে মেতে উঠেছে। ফ্রান্সের জনগণ আশা করছে অচিরে সম্রাটের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সম্রাটের উত্তরাধিকারী কে হবে—এ চিন্তা আর থাকবে না।

অষ্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্স এখন মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ, ইতালী ফ্রান্সের

করতলগত, পোল্যাণ্ড থেকে রাশিয়া, প্রশিয়া ও অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত—পোল্যাণ্ডবাসী নেপোলিয়নকে তাদের মুক্তিদাতা বলে মনে করতে লাগল। জার্মানীতেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করছে। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নেপোলিয়ন অনেকটা নিশ্চিন্ত। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের মধ্যেও এখন শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু বিপদ হল ইংলণ্ডকে নিয়ে। ইংলণ্ড তার নৌবাহিনী নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পেনও পুর্তুগালকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

নেপোলিয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ফ্রান্সের ভেতরে জেকোবিন ক্লাব ও রাজন্যশক্তি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইংলণ্ডের প্ররোচনা ও আর্থিক সাহায্যে ইয়োরোপের কিছু কিছু রাজন্যবর্গ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন।

নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে শিক্ষা দেবার জন্য ঘোষণা করলেন কন্টিনেন্ট্যাল সিসটেম। অর্থাৎ ইংলণ্ডের কোন জাহাজ ইয়োরোপের কোন বন্দরে নোঙর করতে পারবে না। নেপোলিয়ন ইয়োরোপের তাঁর তাবেদার সব রাষ্ট্রগুলিকে হুঁসিয়ার করে দিলেন। ইংলণ্ডের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু হল্যাণ্ডের সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতা ল্যুই বোনাপার্ট—যাঁকে নোপোলিয়নই হল্যাণ্ডের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেছিলেন—তিনিই নেপোলিয়নের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন।

ল্যুই বোনপার্ট ইংলণ্ডের জাহাজ হল্যাণ্ডের বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দিলেন। ইংলণ্ডের এতে খুব সুবিধে হল। হল্যাণ্ডের মাধ্যমে ইংলণ্ডের জিনিষপত্র ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দেবার অসুবিধা হল না। নেপোলিয়ন ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। ল্যুই বোনাপার্ট সিংহাসন ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করলেন।

এ সময় মেরিয়া লুইসা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

ফ্রান্সের জনগণ আনন্দে মেতে উঠল। আনন্দে ফ্রান্সের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কয়েকদিন ধরে প্যারিস নগরীতে নৃত্যগীতি অবিরাম ধারায় চলল।

যোসেফাইনের কাছে এ আনন্দ সংবাদ পৌঁছালে মহৎ ও উদার-চেতা যোসেফাইন আনন্দে অশ্রুপাত করলেন। সম্রাটের মনের শান্তিতে তিনি যে কতখানি সুখী তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। তিনি হয়ত ভাবছেন—এই পুত্রসন্তান যদি আগে তাঁর গর্ভে আসতো তাহলে ত তিনি এভাবে সম্রাট কর্তৃক পরিত্যক্ত হতেন না। সবই বিধাতার ইচ্ছে। ম্যালমাইসনের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে বসে যোসেফাইন কত কথাই না আজ ভাবছেন—একমাত্র তিনি নিজে এবং অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে বুঝবে?

ইউজিন ম্যালমাইসনে যোসেফাইনের কাছে যাচ্ছেন শুনে নেপোলিয়ন বললেন, "You are going to see your mother Josephine; tell her I am certain she will rejoice over my good fortune more than any body else".

যোসেফাইন লুইসার পুত্র সন্তান লাভের সংবাদে সত্যিই আনন্দিত। কিন্তু মেরিয়া লুইসা যোসেফাইনকে সহ্য করতে পারতেন না। সম্রাটের কাছে যোসেফাইনের নাম শুনলে তেলে বেগুণে জলে উঠতেন। তবে ইউজিন ও হরতেন্সকে লুইসা অপছন্দ করতেন না। যোসেফাইনের প্রতি লুইসার বিন্দুমাত্র অনুকম্পা নেই, দয়া নেই, নেই কোন মায়া। যোসেফাইন অবশ্য লুইসাকে এখন আর ঈর্ষার চোখে দেখেন না। বিশেষত সম্রাট তাঁকে নিয়ে যখন সুখী তখন যোসেফাইনের ত দুঃখের কিছু নেই।

এর মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের রাষ্ট্রনায়কগণ একত্রিত হল। নেপোলিয়নকে লিপজিগের যুদ্ধে বিভিন্ন জাতির সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করতে হল। যাকে বলা হয় Battle of Nations। ফন্টেনব্লুর সন্ধিতে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সিংহাসন ছাড়তে

বাধ্য হলেন। এল্‌বা দ্বীপে গিয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে লাগলেন।

যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় বরণ ও তাঁর এল্‌বা দ্বীপে চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে মেরিয়া লুইসা পুত্রসহ অস্ট্রিয়ায় বাবার কাছে চলে যান। যোসেফাইন কিন্তু সম্রাটের এ দুঃসংবাদে পাগলিনী প্রায়। এ দুর্দিনে নেপোলিয়নের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য যোসেফাইন অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন সম্রাটের এ দুঃসময়ে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। যোসেফাইন বলতে লাগলেন, **"My presence now is necessary to the Emperor, Maria Luisa ought to be there, but she has fled. ....The Emperor is alone forsaken I, at least, will not abandon him. He could dispense with me while he was happy. But now, I he expects me."**

নানান চিন্তা ভাবনা করে যোসেফাইন প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। তখন, বুরবোঁ সম্রাট অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে বসেছেন। এ সময়ে বহু বিদেশী শক্তি ফ্রান্সে এসে হাজির হয়েছে। রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারও প্যারিসে এসেছেন। যোসেফাইন প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। স্থির করলেন তিনি যে কোন উপায়ে এল্‌বাতে গিয়ে নেপোলিয়নের সাথে দেখা করবেন। তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হল না। বাধ্য হয়ে তাঁকে ম্যালমাইসনে ফিরে আসতে হল। ম্যালমাইসনে অনেক বিদেশী রাষ্ট্র প্রধান এসে যোসেফাইনের সাথে দেখা করলেন। তাঁদের মধ্যে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডার অন্যতম।

এ সমস্ত কিছুই নেপোলিয়নের প্রতি যোসেফাইনের গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি। নেপোলিয়নের এল্‌বা দ্বীপে বিষাদময় জীবনযাপনের কথা চিন্তা করে যোসেফাইন অস্থির হয়ে পড়লেন। নেপোলিয়নের কাছে তাঁর মনোবেদনার কথা জ্ঞাপন করে চিঠি পাঠালেন। তিনি যে এ সময় এল্‌বা দ্বীপে গিয়ে তাঁর

এনিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হতে চান সেটাও নেপোলিয়নকে জানালেন।

নেপোলিয়নের কাছ থেকে কোন উত্তর এলো না। হঠাৎ যোসেফাইন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নেপোলিয়নের চিন্তায় তিনি বড়ই কাতর। সম্ভবতঃ এ চিন্তায় তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। এ সময় বুরবোঁ সম্রাট অষ্টাদশলুই নেপোলিয়ন যোসেফাইনের জন্য যে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেটাও বন্ধ করে দিলেন। তাই তাঁর আর্থিক অবস্থাও চরমে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুর দিন আগতপ্রায়।

তিনি তাঁর সম্পত্তি ইত্যাদির ভাগাভাগি কিভাবে হবে তার জন্য একটি উইলের খসড়া তৈরি করে নেপোলিয়নের সম্মতির জন্য এলবা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। এবং ওখানে নেপোলিয়নের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে দিতে তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে যোসেফাইন সেণ্ট লিউতে পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেন্সকে নিয়ে একসঙ্গে আহার করলেন। তার দুদিন পর তিনি ম্যালমাইসনের প্রাসাদে ফিরে এলেন। যোসেফাইনের সাথে দেখা করার জন্য রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারও এলেন। পরদিন থেকেই যোসেফাইনের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। ডাক্তার এলেন কিন্তু তাঁরা যোসেফাইনকে সুস্থ করে তোলার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। এভাবে বেশ কিছুদিন কাটলো। অবশেষে ২৭শে মে, ডাক্তাররা যোসেফাইনের জীবনের সব আশা ত্যাগ করলেন। পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেন্সকে খবর পাঠানো হলো।

২৮শে মে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফাইনের অন্তিম সময়। পুত্র ও কন্যা তাঁর মৃত্যু শয্যাপাশে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। পাশে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডার। যোসেফাইন অস্ফুটস্বরে বলে গেলেন, **'I shall be regretted! I have always desired the happiness of France—I did all I could to contribute to it—and I can say with truth to you all, in my last moments,**

that the first wife of Napoleon never caused a tear to fall."

যোসেফাইনের জীবন দীপ নির্বাপিত হল। ইউজিন ও হরতেন্স কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। স্বামী নেপোলিয়ন কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েও যোসেফাইন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নেপোলিয়নের কথায় চিন্তা করে গেছেন। নেপোলিয়নের এলবা দ্বীপের বিষাদময় জীবনের কথা চিন্তা করে যোসেফাইন নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছেন। ছুটে যেতে চেয়েছিলেন এলবা দ্বীপে নেপোলিয়নের কাছে। কিন্তু না তিনি পারেন নি। তখন লুইসা ত পুত্রসহ বাপের বাড়ি পাড়ি দিয়েছেন, মেরিয়া ওয়ালাস্কাও ত তখন অনেক দূরে। যোসেফাইন নেপোলিয়নের এ অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ভেবে অল্পদিনের মধ্যেই ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন।

নেপোলিয়ন জীবনে অনেক নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। প্রেম নিবেদন করেছিলেন অনেক নারীকে। মেরিয়া লুইসাকে আইন সঙ্গত উপায়ে বিয়ে করে তিনি লাভ করলেন পুত্র সন্তান—ফ্রান্সের ভাবী উত্তরাধিকারী। মেরিয়া ওয়ালস্কা—যাঁকে নেপোলিয়নেয় পোলিশ স্ত্রী বলা হতো—তাঁর সাথেও তিনি দেহসুখ উপভোগ করেছিলেন এবং তাঁর ঔরসে ওয়ালাস্কার গর্ভে নেপোলিয়নের পুত্র সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু কই কেউত নেপোলিয়নকে যোসেফাইনের মত এরকম মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারেননি।

নেপোলিয়নের অন্তিম সময়ে যোসেফাইন জীবিত ছিলেন না। যোসেফাইনের মৃত্যুর পর সাত বছর নেপোলিয়ন জীবিত ছিলেন—এবং সেন্ট হেলেনার বন্দীজীবনে নেপোলিয়ন একদিকে রোগ যন্ত্রণা আর একদিকে মানসিক যন্ত্রণার যে অসহনীয় কষ্ট পেয়েছেন তা দেখার দুর্ভাগ্য যোসেফাইনের হয়নি। যোসেফাইন ততদিন জীবিত থাকলে নেপোলিয়ন তাঁর মধ্যেই এ সঙ্কটকালে একমাত্র সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন। যা মেরিয়া লুইসা বা মেরিয়া ওয়ালাস্কার কাছ থেকে নেপোলিয়নের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি। যোসেফাইনের মত একরম একটি মহৎ নারীচরিত্র বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

মেরিয়া ওয়ালাস্কা, মেরিয়া ল্যুইসা ও নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন জীবনে বহু নারীর সান্নিধ্যে এসেছেন। নারীর সৌন্দর্য, নারীর মমত্ববোধ, স্নিগ্ধ ও নমনীয় ভাব, সর্বোপরি তাদের মাতৃত্ব নেপোলিয়নকে আকর্ষণ করেছিল-বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। নেপোলিয়নের বৈধ বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন দুজন। যোসেফাইন ও মেরিয়া ল্যুইসা। এ ছাড়া তিনি আরও অনেক নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন কায়রোতে তাঁর সঙ্গিনী পলিন ফোর্স আর দুজন কায়রোর অভিনেত্রী ও ম্যাডেমোসাইল জর্জ। তাঁর দুজন রাজদরবারের রূপসী মহিলা-ম্যাডাম ডুচাটেল ও ডেন্যুয়েল, লিয়নের একজন রূপসী কুমারী এমিলা পেল্লাপ্রা এবং পোল্যাণ্ডের শ্রীমতী মেরিয়া ওয়ালাস্কা প্রভৃতি।

এঁদের প্রত্যেকের সাথে নেপোলিয়নের দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নারীর মোহ নেপোলিয়নকে সময় সময় এমন ভাবে আকৃষ্ট করতো যে, তখন তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যেতেন। যিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বিনিদ্র নিশিযাপন করতেন, দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন, যিনি কুড়ি বৎসর ধরে এক নাগাড়ে যুদ্ধ করেছেন সমগ্র ইয়োরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে, যিনি যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, যিনি অশ্বপৃষ্ঠেই কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নিয়ে সতেজ হয়ে আবার শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যাঁর এক মুহূর্ত অন্যদিকে সময় দেবার ফুরসৎ ছিলনা সে রকম একজন মহা সেনানায়কের পক্ষে এতগুলি স্ত্রীলোকের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশা করা, নিশিযাপন করা যেন ভাবতেও অবাক লাগে।

ভিনসেন্ট ক্রোনিন বলেছেন নারীর প্রতি নেপোলিয়নের এই আকর্ষণ সামাজিক দিক থেকে অশোভন ছিল। অন্যান্য নারীর প্রতি নেপোলিয়নের এই আকর্ষণ তাঁর মহীয়সী সম্রাজ্ঞী যোসেফাইনকে পলে পলে দগ্ধ করেছিল। যোসেফাইন এজন্য নেপোলিয়নের কাছে অঝোরে কেঁদেছেন, পুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেন্সকে পাঠিয়েছেন নেপেলিয়নকে বুঝাতে।

নেপোলিয়ন যেন বুঝেও বুঝতেন না। কামের মোহ তাঁকে সময় সময় অন্ধ করে দিত। দৈহিক সুখভোগ ক্ষণিকের জন্য তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলতো। অবশ্য এ কামরিপুর মোহে জর্জরিত হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদেরও পদস্খলন ঘটেছে। বিভিন্ন মহাকাব্যে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বর্তমান। অতএব নেপোলিয়নের নারীর প্রতি এ আসক্তিকে দোষাবহ বলে মনে করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এটা তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি। নেপোলিয়ন তাঁর বিবাহিতা দুজন স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত নারীর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মধ্যে মেরিয়া ওয়ালাস্কা ছিলেন অন্যতমা। তাঁকে নেপোলিয়নের পোলিশ স্ত্রী বলা হতো।

নেপোলিয়ন সমগ্র বিশ্বকে জানিয়েছেন ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী। নিষ্পেষিত জনমানসে সৃষ্টি করেছিলেন নবজাগরণের প্রেরণা।

তাঁর ইতালি অভিযান, জার্মান অভিযান, তুরস্ক অভিযান এবং পোল্যাণ্ড অভিযান এর সাক্ষ্য বহন করছে।

পোল্যাণ্ডের জনগণকে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত করে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। যার জন্য অনেক ফরাসী সৈন্যের রক্ত ঝরিয়েছেন পোল্যাণ্ডের মাটিতে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে। তিনি পোল্যাণ্ডের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস নামক-

এক নতুন রাজ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে রাশিয়ার সাথে তাঁর ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত হয়। রাশিয়া চেয়েছিল পোল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাতে। লুঠের সামগ্রীর ন্যায় পোল্যাণ্ডকে টুকরো টুকরো করে তারা ভাগ করেও নিয়েছিল। নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হলে রাশিয়ার সাথে তার এই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। যার পরিণতি রাশিয়ার সাথে নেপেলিয়নের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। পরিণামে যা নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে দেখা দিয়েছিল।

পোলিশরা নেপোলিয়নকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাঁকে তারা জানিয়েছিল তাদের হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধা। নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন সত্যি কিন্তু পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করতে পারেননি। তবে তাদের নিজস্ব একটি সম্পূর্ণ নতুন সৈন্য বাহিনী তিনি গঠন করে দিয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার অংশ নিয়েই তিনি গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস নামক নতুন রাষ্ট্রটির সৃষ্টি করেছিলেন। ওয়ারগ্রামের যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়া থেকে গৃহীত অঞ্চল তিনি পোল্যাণ্ডের সাথে যুক্ত করেছিলেন।

পোল্যাণ্ডের জন্য নেপোলিয়ন যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তার পেছনে অন্য একটি বিশেষ কারণও বর্তমান ছিল। তা হচ্ছে রূপসী পোলিশ রমণী মেরিয়া ওয়ালাস্কার প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ। যাঁর রূপে নেপোলিয়নের হৃদয় বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। যাঁকে নেপোলিয়ন তাঁর হৃদয়ের অপার ভালবাসা নিবেদন করেছিলেন।

কিন্তু মেরিয়া ওয়ালাস্কা নেপোলিয়নের এত সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও সহজে তাঁকে ধরা দেননি। নিজের সতীত্বকে তিনি বিসর্জন দিতে চাননি। দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের মুখের দিকে চেয়ে—সর্বোপরি তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর অনুরোধে তিনি নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

Irving wallace তাই মন্তব্য করেছেন যে, "she succumbed not out of need for security or love but according to persistent logic of politics and patriotism, she was seduced by deplomacy, love came after."

মেরিয়া ওয়ালাস্কা তাঁর সতীত্ব বিসর্জন দেবার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে চিরনিন্দিতা হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে পোলিশরা। যিনি নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে স্বদেশ বাসীকে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সে মহৎ হৃদয়া নারী বিশ্বের ইতিহাসে নিন্দিতা হলেও পোল্যাণ্ডবাসীদের কাছে মহীয়সী নারীরূপেই স্বীকৃতা।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া ওয়ালাস্কা পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মেরিয়া ল্যাস্কজিনস্কা। তিনি পোল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত অথচ গরীব ঘরের সন্তান। তিনি ছিলেন বিধবা মায়ের রূপসী কন্যা, শৈশবে পিতাকে হারান, তাঁরা ছিলেন সাত ভাই বোন। অনাথা বিধবা মায়ের পক্ষে এতবড় সংসারের ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য ছিল না।

এ সময়ে মেরিয়ার ভরা যৌবনের অসামান্য রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হন—পোল্যাণ্ডের এক বিরাট ধনী ব্যক্তি। নাম কাউণ্ট অ্যানাসটেসিও কলোন্না ওয়ালেস্কি। কলোন্না ওয়ালেস্কি ছিলেন পোল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ বংশের সন্তান। তিনি ছিলেন পোল্যাণ্ডের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। অবশ্য বয়সে মেরিয়া অপেক্ষা ৫৩ বৎসরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ মেরিয়ার বয়স যখন ১৫ কলোন্না ওয়ালেস্কির বয়স তখন ৬৮। ওয়ারস শহরের নিকটে ওয়ালেউইস নামক স্থানে ওয়ালেস্কির এক বিরাট দুর্গ ছিল। কলোন্না শুধু বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক আগে দুবার বিয়ে করেছিলেন। দুবারই তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে।

এখন মেরিয়াকে সহধর্মিনী হিসেবে পাবার জন্য তিনি পাগল হয়ে

উঠেছেন। অবশ্য দোষটা তাঁর একার নয়। মেরিয়ার মার ইচ্ছেতেই কলোনা এতখানি এগোতে সাহস করেছিলেন। মেরিয়ার মার পক্ষে ছেলে মেয়েদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া দায় হয়ে উঠেছিল। তদুপরি ধারে দেনায় তাঁদের বাড়িঘর পর্যন্ত সব নিলামে যাবার উপক্রম। কোথায় থাকবেন, কি করে ছেলে মেয়েদের জন্য দুবেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, এই চিন্তায় যখন তিনি পাগলিনী প্রায় সে সময় তাঁদের বাড়ীতে আবির্ভাব ঘটল ৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ কলোন্না ওয়ালেস্কির।

মেরিয়ার রূপে কলোন্না ওয়ালেস্কি তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। সুতরাং মেরিয়ার মার পক্ষে ওয়ালেস্কির হাতে মেরিয়াকে তুলে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করার কোন অসুবিধেই হল না।

মেরিয়া কিন্তু প্রথমে এই বিয়েতে সম্মতি দিতে চাননি। ভরা যৌবনের টগবগে চেহারার ১৫ বৎসরের মেয়ের পক্ষে তার ঠাকুরদাদার বয়সী একজন বৃদ্ধকে বিয়ে করার জন্য মতদিতে পারে এটা ভাবলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ওয়ালেস্কির ছোট নাতিটি ও মেরিয়া অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড় ছিলেন। এমতাবস্থায় মেরিয়ার মনের ভাব সহজেই অনুমান করা কারো পক্ষে হয়ত অসুবিধে হবে না।

মেরিয়ার মা কিন্তু ছাড়ার পাত্রী নন্। যেভাবে হোক মেরিয়াকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কলোন্না ওয়ালেস্কির হাতে তুলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। হায় বিধাতা অভাব মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৬ বৎসর বয়সের মেরিয়ার সাথে কলোন্না ওয়ালেস্কির বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কলোন্না মেরিয়ার মায়ের ধার দেনা শোধ করে দিলেন। তাঁদের বাড়িঘর নিলামের হাত থেকে রক্ষা পেল। এবং কলোন্না মেরিয়ার দাদাকে প্যারিসে পড়াশুনার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বিয়ের পর মেরিয়া স্বামীর সাথে ইতালিতে হানিমুনে গেলেন ফিরে এসে স্বামীর সাথে সুখে ঘর বাঁধলেন। কলোন্নার ঔরসে মেরিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করল এক রুগ্ন পুত্র সন্তান। মাতৃত্বের টানে বৃদ্ধ

স্বামীর সদয় ব্যবহারে মেরিয়া সব ভুলে গিয়ে বৃদ্ধকে নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন। এ সময়ে পোল্যাণ্ডে চলেছে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। ১২ বৎসর ধরে রাশিয়া, প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়া পোল্যাণ্ডকে ভাগাভাগি করে নিয়ে পোল্যাণ্ডবাসীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পোলিশরা মরণপন সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত। তারা নেপোলিয়নের স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। নেপোলিয়নকে তারা তাদের দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাল।

১৮০৬ সাল। নেপোলিয়ন তখন ফরাসী সম্রাট। সম্রাজ্ঞী তাঁর প্রিয়তমা যোসেফাইন। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থুরু করলেন। প্রত্যেক পোল্যাণ্ডবাসী তাঁকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করলেন। পোল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় মেরিয়া ওয়ালেস্কা ও নেপোলিয়নের গুণগ্রাহী ছিলেন। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ডিসেম্বরের শীতে নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছেন—সমগ্র পোল্যাণ্ডবাসী নেপোলিয়নকে সাদর অভিনন্দন জানাবার জন্য রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এই অগণিত জনসমুদ্রে মেরিয়া ওয়ালস্কা ও তাঁর স্বামী সহ এসে দাঁড়িয়েছেন সকলের সাথে।

নেপোলিয়ন বীরদর্পে চলেছেন। তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলতে চলতে ব্রোনিয়া নামক একটি গ্রামে এসে হাজির হলেন নেপোলিয়ন। অগণিত পোলিশ জনতা সমস্ত ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তাঁকে জানাল সাদর সম্ভাষণ। নেপোলিয়নের চোখ ছিল ঈগল পাখির মত তীক্ষ্ণ। মানুষের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে তার হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌঁছবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। মেরিয়ার ভরা যৌবনের অপরূপ রূপের ছটা নেপোলিয়নের হৃদয় বিদীর্ণ করল। যেতে যেতে নেপোলিয়ন গাড়ি থেকে মেরিয়াকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিলেন স্বহস্তে।

নেপোলিয়নের জীবনী লেখক ক্র্যাভারিক ম্যাসন মেরিয়ার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে "She had fair haired with big blue eyes full of simplicity and tenderness, and a smooth skin and all rosy with the freshness of a tearose blushing with shyness."

প্রথম দেখাতেই নেপোলিয়ন মেরিয়ার প্রেমে পড়ে গেলেন। শত্রু সৈন্যদের বিতাড়িত করে নেপোলিয়ন কিছু দিন ওয়ারস শহরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে শত্রু সৈন্যের পিছু ধাওয়া করা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করে নেপোলিয়ন বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত ওয়ারস শহরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই সময়ে মেরিয়ার কথা তাঁর বার বার মনে পড়তে লাগল। তাঁর মনে লাগল দোলা। মেরিয়ার অপূর্ব রূপলাবণ্য, অপূর্ব তাঁর চোখের চাহনি, তাঁর সরলতা সব মিলে মনে হচ্ছিল যেন একটি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ সলজ্জিত নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

নেপোলিয়নের জৈবিক প্রেম নেপোলিয়নকে স্থির থাকতে দিল না। নেপোলিয়ন তাঁর যুদ্ধ মন্ত্রী টেলির‍্যাণ্ডকে মেরিয়ার খোঁজ করার জন্য পাঠালেন। পোলিশ গবর্ণর রাজকুমার পয়োনটস্কিকেও তিনি খবর দিয়ে পাঠালেন, মেরিয়াকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য পয়োন-টস্কিকেও নির্দেশ দিলেন নেপোলিয়ন, পয়োনটস্কিকে আরো বলে দিলেন মেরিয়া যেন নেপোলিয়নের সাথে (Blace Pelace) ব্লেস প্রাসাদে এ নাচার জন্য তৈরি হয়ে আসেন।

যথা সময়ে মেরিয়ার কাছে সংবাদ পৌঁছল। মেরিয়া কিন্তু অবিচল। তিনি নেপোলিয়নের এই অমেন্ত্রণে সাড়া দিতে নারাজ। দেশবাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধেও তাঁর মন টলানো গেল না। পরিশেষে কলোন্না ওয়ালেস্কি নিজের দেশের কথা চিন্তা করে পত্নী মেরিয়াকে বোঝালেন তিনি যেন এমন কিছু না করেন যাতে পোল্যাণ্ডের এই দুর্দিনের সাথী নেপোলিয়ানের মনে আঘাত লাগতে পারে।

অবশেষে স্বামীর অনুরোধে মেরিয়া স্বামীর হাত ধরেই নেপোলিয়েনর কাছে এলেন। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে তাঁর সাথে নাচতে অনুরোধ জানালেন। মেরিয়া কিন্তু নেপোলিয়নের কথায় রাজি হলেন না। মেরিয়াকে অনেক অনুনয় করা হল কিন্তু কোন ফল হল না। নেপোলিয়ন ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে কি কারণে তিনি নেপোলিয়নকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। মেরিয়া নিরুত্তর।

মেরিয়া হঠাৎ রাগত ভাবে স্বামীর কথার অবাধ্য হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। নেপোলিয়ন হতাশ হওয়ার পাত্র নন। যে ভাবে হোক তিনি মেরিয়াকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবেন। কিভাবে মেয়েদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয় সে ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান অনেকের চাইতে বেশি। অতএব তিনি সহজে হার মানতে রাজি নন। পরদিন সকালে নেপোলিয়ন তাঁর একজন বিশেষ দূতকে একটি ফুলের তোড়া ও একটি ছোট চিরকুট লিখে মেরিয়ার কাছে পাঠালেন। চিরকুটে লেখা ছিল, **"I saw no one but you, I admired no one but you, I want no one but you, Answer me at once and assuage the impatient passion of Napoleon"**

নেপোলিয়নের স্পষ্ট বক্তব্য মেরিয়াকে যুগপৎ ভাবিত ও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। মেরিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন তিনি নেপোলিয়নের এ চিঠির কোন উত্তর দেবেন না। এবং নেপোলিয়নের দূতকে কঠোর ভাষায় মেরিয়ার কাছ থেকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। নেপোলিয়ন পরের দিন আবার একখানা চিঠি সহ মেরিয়ার কাছে লোক পাঠালেন। এবার মেরিয়া নেপোলিয়নের চিঠিটি খোলার প্রয়োজন মনে করলেন না। এদিকে মেরিয়ার প্রতি নেপোলিয়নের আসক্তির কথা পোল্যাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজকুমার পয়োনটস্কি মেরিয়ার কাছে এসে হাজির হলেন। নেপোলিয়নের চিঠিখানা খুলে মেরিয়াকে পড়ে শুনালেন। নেপোলিয়ন অত্যন্ত বিনীতভাবে মেরিয়াকে লিখেছেন যে যখন তাঁর ভালবাসা মেরিয়ার প্রতি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে-তখন মেরিয়া কেন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে আরও জানালেন মেরিয়া যেন তাঁকে ক্ষণিকের জন্য হলেও আনন্দ ও সুখ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে আসেন। নেপোলিয়নের কোমল হৃদয় যে মেরিয়ার করুণা ভিক্ষে করছে এটাও তিনি মেরিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে মেরিয়ার রূপলাবণ্যে নেপোলিয়ন এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয় দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যে যেন মেরিয়ার করুণা ভিক্ষে করছেন। হায় বিধাতা! কি তোমার মহিমা নেপোলিয়নের মত এরকম একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একজন সাধারণ নারীর কাছে কিভাবে আত্মসমর্পণ করছেন—এ যেন জুলিয়াস সীজারের ক্লিয়োপেট্রার কাছে প্রেম নিবেদনের চেয়েও বেশি হৃদয়বিদারক।

মেরিয়া কিন্তু এতেও সম্মতি দিলেন না। মেরিয়া তাঁর সংকল্পে অটল। তিনি নেপোলিয়নের কাছে নিজেকে সপে দিতে নারাজ। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন শত অনুনয় বিনয় করে তিনি মেরিয়ার মন জয় করতে পারবেন না। এবার নেপোলিয়ন অন্যপথ ধরলেন। তিনি মেরিয়াকে কঠোর ভাষায় চিঠি লিখলেন। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা মেরিয়া যদি প্রকৃত পক্ষে কামনা করেন—তাহলে নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ ছাড়া তা সম্ভব নয়। এবং পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য ফরাসী সৈন্যের তিনি রক্ত ঝরাতে পারেন পোল্যাণ্ডের মাটিতে শুধু একটি সর্তে যে নেপোলিয়নের কথায় সম্মতি দিয়ে মেরিয়াকে নেপোলিয়নের কাছে আসতে হবে।

নেপোলিয়ন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড্যুরোকে মেরিয়ার কাছে পাঠালেন।

ভ্যুরো মেরিয়াকে নেপোলিয়নের মনের কথা খুলে বললেন। মেরিয়া কিন্তু নিরুত্তর। মেরিয়া চিন্তা ক্লিষ্ট। বিস্ময়ে হতবাক। একদিকে দেশের স্বার্থ, অন্যদিকে নিজের সতীত্ব। কোন্‌টাকে ছাড়বেন তা তিনি ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না।

প্রায় ৩০ জন সম্ভ্রান্ত পোলিশ নরনারী মেরিয়ার কাছে গেলেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। দেশের স্বার্থে মেরিয়াকে নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। তাঁরা মেরিয়ার কাছে সমস্ত পোল্যাণ্ডবাসীর হয়ে অনুনয় বিনয় করে তাঁদের লিখিত বক্তব্যও পাঠালেন। তাতেও কোন কাজ হলো না। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা মেরিয়ার স্বামীর শরণাপন্ন হলেন।

মেরিয়ার স্বামী কলোন্না ওয়ালেস্কি মেরিয়াকে অনেক বোঝালেন। কলোন্না হয়ত ভেবেছিলেন নেপোলিয়ন মেরিয়াকে প্রকৃত পক্ষে বান্ধবী হিসেবে পেতে চান। অন্য কোন উদ্দেশ্য যে নেপোলিয়নের আছে সে কথা কলোন্না প্রথমে ভাবতে পারেননি। তিনি আরো ভেবেছিলেন নেপোলিয়ন হয়ত তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য রূপসী মেরিয়ার সাহচার্য চান।

কিন্তু নেপোলিয়নের অন্তর্বেদনা যে অন্যখানে। কলোন্না ওয়ালেস্কি মেরিয়াকে অনেক করে বললেন। মেরিয়াকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে মেরিয়া যদি ছেলে হতেন তাহলে তাঁকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হতো। হয়ত তাঁকে দেশের স্বর্থে প্রাণও বিসর্জন দিতে হতো। দেশ মাতৃকার সন্তান হিসেবে মেয়ে হয়েও দেশের সেবার জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন না কেন?

অবশেষে মেরিয়া নেপোলিয়নের ইচ্ছাপূরণে সম্মতি দিলেন। তিনি নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত—সেটা স্বামীকে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে জানালেন। মেরিয়া স্বামীর মুখের দিকে একবারও তাকালেন না। কর্তব্যের আহ্বানে মানুষ যেমন ছুটে চলে—মেরিয়াও যেন দেশের প্রতি কর্তব্যের টানে চলেছেন নেপোলিয়নের কাছে।

নেপোলিয়নের মনোবাসনা পূরণ করতে, তাঁকে সঙ্গ দিতে। তাঁর তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করতে।

মেরিয়া নেপোলিয়ানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মেরিয়া নেপোলিয়নের কাছে কোন করুণা ভিক্ষে করতে যাননি। বরঞ্চ নেপোলিয়নই মেরিয়ার কাছে করুণা ভিক্ষে করছেন। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে দেখে ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগলেন। মেরিয়ার মুখে কোন শব্দ নেই। চুপচাপ চিত্রাপিতের ন্যায় নেপোলিয়নের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। মুখে যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে।

ভিক্ষা নয়, করুণা নয়, দয়া নয়, মায়া নয়, কঠোর মেরিয়া কঠোর-তর হয়ে উঠলেন—মুখ তাঁর মেঘাচ্ছন্ন ক্রুর কিংবা বক্র হাসির লেশ মাত্র নেই তাঁর মুখে। নেপোলিয়নের সাথে কি ভাবে কথা বলতে হবে তাও যেন তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এর মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁর রক্ষী কনস্টেন্টকে (Constent) ডাকলেন।

নেপোলিয়ন জানতে পারলেন তাঁর দুজন অনুচর মেরিয়াকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা তামাসা করেছে। নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ তাদের অন্যত্র বদলির নির্দেশ দিলেন।

নেপোলিয়ন সকলকে তাঁর ঘর থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। মেরিয়া ও নেপোলিয়ন ভিন্ন ঘরে। সেখানে আর কেউ নেই। মেরিয়া একখানা আরাম কেদারায় বসে বিষন্ন বদনে চিন্তা-মগ্ন। ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নেপোলিয়ন মেরিয়ার কাছে গিয়ে তাঁর দুবাহু দিয়ে মেরিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন। বার বার চমু দিতে লাগলেন মেরিয়াকে। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে তাঁর গভীর সোহাগ জানালেন।

মেরিয়া কিন্তু নিরুত্তর, নিস্তব্ধ। দুচোখের জল তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে ঝরতে লাগল। নেপোলিয়ন তাঁর নিজের রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। এযেন স্বামী-স্ত্রীর রাগ অনুরাগ চলছে। নেপোলি-লিয়নের বাহুডোর থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মেরিয়া অনেক চেষ্টা

করেও সহজে ছাড়াতে পারলেন না।

নেপোলিয়ন মেরিয়ার মনের ভীতির কথা বুঝতে পারলেন। এবার নেপোলিয়ন করুণ স্বরে মেরিয়াকে পোল্যাণ্ডের স্বার্থের কথা বলতে লাগলেন এবং পোল্যাণ্ডকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাও জানালেন। এবং নেপোলিয়ন যে পোল্যাণ্ডের স্বার্থকে অনেকটা নিজের দেশের স্বার্থের মতন মনে করছেন তাও তাঁকে জানালেন।

এবার মেরিয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নেপোলিয়ন মেরিয়ার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলেন। নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর এত রূপ এত অল্প বয়স তিনি কেন এরকম একজন তাঁর ঠাকুরদাদার বয়সী লোককে বিয়ে করতে সম্মতি দিয়েছিলেন? মেরিয়া শুধু বললেন তিনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন তাঁর স্বামীর হাত থেকে তাঁকে কেউ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে পারবেন না।

এমন সময় হঠাৎ এক জরুরী বার্তা নিয়ে ড্যুরো এসে হাজির হলেন নেপোলিয়নের কাছে। নেপোলিয়নের কথোপকথনে বাধা পড়ল। ড্যুরো এসে ঘরে ঢুকতেই নেপোলিয়ন যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। মেরিয়াকে ছেড়ে দিলেন। মিষ্ট কণ্ঠে বললেন মেরিয়া তাঁর প্রিয়তমা। কিন্তু মেরিয়া যে কেন এখনো তাঁকে ভয় পাচ্ছেন তাঁর কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

নেপোলিয়ন মেরিয়াকে সে সময় বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। মেরিয়াকে ভীতু ঘুঘু পাখির সাথে তুলনা করে বললেন যে মেরিয়া যেন নেপোলিয়নকে দেখে ভয় না পান। নেপোলিয়ন আরও বললেন তিনি ঈগল কিম্বা বাজ পাখি নন যে ছোঁ মেরে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবেন।

নেপোলিয়ন মানুষ! মনুষ্য হৃদয়ের দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সবই তাঁর মধ্যে আছে। শুধু জৈবিক প্রয়োজনে নয় প্রেম

ও মায়া ডোরে তিনি মেরিয়াকে আবদ্ধ করে রাখতে চান। মেরিয়া যেন তাঁর ডাক পেলে আবার সত্বর তাঁর কাছে চলে আসেন। মেরিয়াকে স্নেহ চুম্বন দিয়ে নেপোলিয়ন তাঁকে সেদিনের জন্য বিদায় দিলেন।

ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন নেপোলিয়নের পৌরুষকে যে অচিরেই মেরিয়া প্রশংসা করবেন এবং নেপোলিয়ন না ডাকলেও মেরিয়া যে এসে তাঁকে ধরা দেবেন একথা নেপোলিয়ন তাঁকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মেরিয়া স্বামী কলোন্না ওয়ালেস্কির কাছে ফিরে গেলেন। কিন্তু তার পরের দিনই নেপোলিয়ন মেরিয়ার কাছে ফুলের একটি তোড়া ও একখানি ডায়মণ্ডের হার সহ একজন দূতকে পাঠালেন। এত যুদ্ধের নায়ক, এত কৌশলের স্রষ্টা, রণনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় পোল্যাণ্ড বাসীকে শত্রু হস্ত থেকে মুক্ত করার জন্য যিনি বিভিন্ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত তাঁর মত একজন বীরের পক্ষে একজন মহিলার প্রতি এতখানি আকর্ষণ দেখানো তা যেন সাধারণ লোককে বিস্মিত করে দেয়।

দূত মেরিয়ার হাতে চিঠি ও হীরের হার খানি তুলে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। মেরিয়া চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন। নেপোলিয়ন লিখেছেন যে প্রাণাধিকা মেরিয়ার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখার জন্য নেপোলিয়ন প্রতিনিয়ত চিন্তায় অস্থির। মেরিয়া যেন চিঠি পাওয়া মাত্র আবার তাঁর কাছে চলে আসেন। মেরিয়ার আদর্শনে তিনি তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে চলেছেন। নেপোলিয়ন চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছেন যে রাত্রিতে খাবারের আগেই যেন মেরিয়া তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা দুজনে সে রাত্রিতে পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে পরস্পরের চিন্তাধারা বিনিময় করে পোল্যাণ্ডের কি ভাবে হিত সাধন করা যায় সে ব্যাপারে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

নেপোলিয়নের চিঠির ভাষাটা একটু উল্লেখ করলে পাঠক মনে

হয়ত আরও দাগ কাটবে। নেপোলিয়ন লিখেছেন, "I shall see you at dinner our friend tells me so. I want you to accept this bouquet, I want it to be secret link....between us ...When my hand presses my heart, you will know that I am thinking of no one but you...love me, my pretty one, and hold your bouquet tight."

নেপোলিয়নের প্রেমময় চিঠি মেরিয়ার মনে এতটুকু দাগ কাটল না। ফল হলো উলটো মেরিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর মন থেকে স্বাদেশিকতার চিন্তা বিদূরিত হল। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার চিন্তা তাঁর কাছে সতীত্বের তুলনায় তুচ্ছ মনে হল। অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য।

নেপোলিয়নের প্রেরিত উপহার তিনি গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। ড্যুরোকে সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অতি গম্ভীর এবং ঘৃণার স্বরে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন। ড্যুরো পোল্যাণ্ডর স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে মেরিয়াকে নেপোলিয়ানের প্রতি আকৃষ্ট হতে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন।

কিন্তু কোন ফল হলো না। মেরিয়া তাঁর কাছে মনের কথা গোপন না করে জোর দিয়ে বললেন যে তিনি নেপোলিয়নকে তাঁর দেহ সম্ভোগের সুযোগ দেবেন না। যেখানে তাঁর স্বামী রয়েছেন তিনি বৃদ্ধই হউন বা যুবাই হউন সে তাঁর কাছে অনেক বড়। তিনি আরও বললেন তিনি আত্মহত্যা করে নেপোলিয়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান। তারপর দৃপ্তকণ্ঠে ড্যুরোকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন।

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে মেরিয়া স্বামীর কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিটা অবশ্য স্বামীর কাছে পাঠাতে পারেননি। চিঠিতে উল্লেখ করেছেন নেপোলিয়ন তাঁর দেহ সম্ভোগে পাগল হয়ে উঠেছেন। তিনি স্বামীকে আরও জানালেন যে নেপোলিয়ন জোর পূর্বক তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চান না। তবে তিনি তাঁর প্রণয় পিয়াসী।

এবং নেপোলিয়নের চিঠির মধ্যেই তাঁর কামনা বাসনা ফুটে উঠেছে।

নেপোলিয়ন তাঁকে সে রাতের জন্য নিস্কৃতি দিয়েছেন। স্বামীর কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আজ সকালেই আবার লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাত্রিতে যেন তিনি নেপোলিয়নের কাছে যান এবং তাঁর সঙ্গে একত্রে রাতের আহার সমাধা করেন। তাঁর সাথে নিশিযাপন করেন। এতে মেরিয়া সম্মতি দিতে পারেননি। নেপোলিয়নের দূতকে কটু মন্তব্য করে তিনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ভীত সন্ত্রস্ত। কি ঘটতে যাচ্ছে তা ভেবে তিনি চিন্তা ক্লিষ্ট। সংকল্প করেছেন তিনি আত্মহত্যা করে এসমস্ত অপমানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন।

মেরিয়া চিঠিতে এটাও উল্লেখ করলেন যে, তিনি নেপোলিয়নের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন যে সে রাত্রিতেই তিনি আবার তাঁর কাছে যাবেন। কিন্তু তিনি এখন সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অপারগ। কারণ তিনি ভাল করেই জানেন যে নেপোলিয়নের কাছে গেলে সে রাতে কি ঘটতে পারে? মেরিয়া চিঠি লিখে আবার কি যেন চিন্তা করলেন। হয়ত ভাবলেন স্বামীকে এগুলো লিখে কি লাভ? স্বামী ত চান তাঁর সাথে নেপোলিয়নের একটি ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠুক। যা পোল্যাণ্ড বাসীকে পরাধীনতার গ্লানি মোচনের সুযোগ করে দেবে। নানান চিন্তা ভাবনা করে তিনি স্বামীর কাছে সে চিঠি পাঠালেন না। স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি সে রাত্রিতেই নেপোলিয়নের কাছে যাবেন।

নেপোলিয়নের সাথে রাত্রিতে একসঙ্গে খেতে বসলেন। খাবার টেবিলে মেরিয়া নতমস্তকে নিজের আহারটুকু গ্রহণ করলেন। তিনি লজ্জায় ও ক্ষোভে একবারও নেপোলিয়নের দিকে তাকাতে পারলেন না। একটি কথাও তাঁর সঙ্গে বললেন না। সাথে নেপোলিয়নের আরও একজন অতিথি খেতে বসেছিলেন। খাওয়া শেষে নেপোলিয়ন অতিথিকে বিদেয় দিয়ে মেরিয়াকে থাকতে বললেন।

নেপোলিয়ন মেরিয়াকে নিয়ে ভেতরের শয়ন কক্ষে গেলেন।

নেপোলিয়নের মুখমণ্ডল যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ধীর পদক্ষেপে নেপোলিয়ন মেরিয়ার কাছে গেলেন। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে জানালেন যে মেরিয়া যে সে রাতে আবার তাঁর কাছে আসবেন—তা তিনি কল্পনা ও করতে পারেননি।

নেপোলিয়ন মেরিয়াকে স্নেহের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি নেপোলিয়নের প্রেরিত হীরের মালাটা কেন উপেক্ষা করলেন—ফুলের তোড়াটিও ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন কেন? কেনই বা তিনি তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইছেন। এতে যে নেপোলিয়ন নিজেকে অপমানিত বোধ করছেন। তাও তিনি তাঁকে জানালেন। মেরিয়া নেপোলিয়নের মানসিক দ্বন্দ্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। তবুও তিনি নেপোলিয়নের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দিতে পারছেন না। তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে পলে পলে দগ্ধ হচ্ছেন।

নেপোলিয়ন মেরিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, "you shall—yes, I repeat it-you shall love me! I have made your country's name live once more. The Polish race still exists because of me."

নেপোলিয়নের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। মেরিয়ার রূপে তিনি এতই বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে মেরিয়াকে কাছে পেতে চাইলেন। মেরিয়ার অসম্মতি তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। তাঁর মনে তোলপাড় আরম্ভ হল। হঠাৎ তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। পকেট থেকে বের করলেন তাঁর হাত ঘড়ি। ঘড়িটি মেরিয়াকে দেখিয়ে বললেন এই মুহূর্তে তিনি তাঁর ঘড়িটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। যে কথা সে কাজ। নেপোলিয়ন সজোরে ঘড়িটিকে ছুঁড়ে ফেললেন। ঘড়িটি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণহয়ে গেল।

মেরিয়াকে নেপোলিয়ন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মেরিয়া যদি নেপোলিয়নের প্রস্তাবে সম্মতি না দেন তাহলে তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ডের

কপালেও তা ঘটবে অর্থাৎ পোল্যাণ্ডকেও তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। নেপোলিয়নের এরকম মূর্ত্তি তিনি কোনদিন দেখেননি। তাঁর এমূর্তি মেরিয়াকে বিস্মিত ও হতচকিত করে দিল। মেরিয়া বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ যে এরকম অবস্থায় ছিলেন সেটা তাঁর স্মরণ নেই।

জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর পরিধান বস্ত্র এলো মেলো। সমস্ত শরীরটার ওপর যেন প্রবল বেগে ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের হাওয়ায় তাঁর কোমল দেহ যেন ভূলুণ্ঠিত।

জ্ঞান ফিরে এলেই সামনে দেখতে পেলেন নেপোলিয়নকে। নেপোলিয়ন বিষণ্ণ, নেপোলিয়ন চিন্তাক্লিষ্ট। হায় মনুষ্য হৃদয়! কামরিপুর প্রভাব মানুষকে কত নিচে নামিয়ে আনতে পারে। হয়ত নেপোলিয়ন তা ভেবে চিন্তিত। হঠাৎ কামের মোহে তিনি যা করেছেন তার জন্য অনুশোচনায় চিত্রার্পিতের ন্যায় মেরিয়ার অসহায় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

নেপোলিয়ন ড্যুরোকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর নির্দেশে ড্যুরো মেরিয়াকে প্রাসাদের ভেতরের একটি কামরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ মেরিয়া ঘুমোলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন নেপোলিয়ন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। নেপোলিয়ন অনেক নরম হয়ে গেছেন। নেপোলিয়ন মেরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বলে যেতে লাগলেন তাঁর আশাভরসার কথা, তাঁর চিন্তা, তাঁর স্বপ্ন। পোল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর মমত্ব বোধের কথা।

এ ঘটনা মেরিয়ার মনের ওপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করল। অবিশ্বাস্য ভাবে মেরিয়ার মানসিক পরিবর্তন ঘটল। মেয়েদের মন বোঝা দায়। কথায় বলে স্বয়ং দেবতারাও মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করতে পারেন না। যে মেরিয়া এতদিন নেপোলিয়নকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছেন—সে মেরিয়ায় আবার এখন থেকে নেপোলিয়নের স্বপ্নে বিভোর। এখন মেরিয়া আর তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর জন্য এতটুকু

চিন্তিত নন। অন্য কারো জন্যও তাঁর এতটুকু চিন্তা নেই। এখন নেপোলিয়নই তাঁর একমাত্র কমনা বাসনার পাত্র।

মেরিয়া এখন ১৮তে পা দিয়েছেন। স্বামীর বয়স ৭০। আর নেপোলিয়নের বয়স তখন ৩৭। যৌবন রসে ভরপুর। কিন্তু নেপোলিয়নের দেহ সুগঠিত ছিল না। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ পোষ্ট-মর্টেম করতে গিয়ে ডঃ সি. ম্যাকলরিন (Dr. C. maclaurin) বলেছেন যে, নেপোলিয়নের হাত পা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ছোট। তাঁর গায়ের চামড়া ছিল অত্যন্ত পাতলা। পায়ের রঙ ছিল ফরসা, তাঁর দেহটা ছিল অনেকটা মেয়েলি ধরণের, তাঁর দেহে খুবই কম লোম ছিল। মাথায় চুল ছিল খুবই মসৃণ-অনেকটা সূক্ষ্ম সিল্কের মত। ম্যাকলরিনের ভাষায় বলা যেতে পারে "His skin was white and delicate ; his body had Feminine Characterstics such as wide hips and narrow shoulders ; his reproductive organs were small···There was little hair on the body, and the hair of the head was fine, silky and sparse" প্যারিসে থেকে যোসেফাইন তাঁর স্বামীর মেরিয়া ওয়ালাস্কার প্রতি দুর্বলতার সব খবরই পেয়েছেন। নেপোলিয়নের সাথে মিলিত হবার জন্য যোসেফাইন তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, যোসেফাইন বিস্তারিত ভাবে তাঁর মনের কথা জানিয়ে নেপোলিয়নকে চিঠি লিখলেন। চাইলেন নেপোলিয়নের কাছে যেতে। নেপোলিয়ন প্রমাদ গুণলেন।

নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে জানিয়ে দিলেন আপাতত যোসেফাইনের পোল্যাণ্ডে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আরও জানালেন যে, পোল্যাণ্ডের জলবায়ু ভালো নয়। তাই তিনি যোসেফাইনকে পোল্যাণ্ড যেতে বারণ করছেন। নেপোলিয়ন এটাও জানালেন যে, যোসেফাইনের অদর্শনে তিনিও বিষন্ন, চিন্তা ক্লিষ্ট। তিনি যোসেফাইনকে পোল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে নারাজ শুধু যোসেফাইনের শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে। কেন না পোল্যাণ্ডের সে সময়-

কার প্রাকৃতিক আবহওয়া যোসেফাইনের শরীরের ওপর দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যা যোসেফাইনকে বহুদিন যাবৎ শয্যাশায়ী করে রাখতে পারে। পাঠক সাধারণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, পোল্যাণ্ডে গিয়ে নেপোলিয়ন ও মেরিয়ার প্রণয় স্বচক্ষে দেখে ফেলবেন এ ভয়েই নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে পোল্যাণ্ডে যেতে বারণ করেছেন।

এসময়ে পূর্ব প্রাশিয়ার রুশরা তাদের সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করে ফেলেছে। নেপোলিয়নের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে—নেপোলিয়ন স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করলেন। রুশ সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেবার জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে পূর্ব প্রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। রণক্ষেত্র থেকে ও সময় পেলেই তিনি মেরিয়াকে চিঠি লিখতেন। মেরিয়ার তখন তাঁর মার সঙ্গে ভিয়েনা চলে গেছেন বিশ্রামের জন্য। এভাবে আর একটা শীত ঋতু এসে হাজির হল। নেপোলিয়ন মেরিয়ার অদর্শনে খুবই কাতর হয়ে উঠলেন। মেরিয়াকে নিয়ে আসার জন্য নেপোলিয়ন তাঁর ভাইকে ভিয়েনাতে পাঠালেন।

নেপোলিয়ন তখন প্রাশিয়ার (Finckerstein) ফিঙ্কারষ্টেইন নামক সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করছেন সেখানে থেকেই পরিচালনা করছেন তাঁর সৈন্যবাহিনী, প্রয়োজনীয় নির্দেশ সেখান থেকেই প্রেরণ করছেন যথাস্থানে। নেপোলিয়নের হৃদয়ে সে সময় ক্ষণিকের জন্য অবসাদ এসেছিল। তিনি নিজেকে বড়ই একাকী বোধ করতে লাগলেন। নেপোলিয়নের নির্দেশে মেরিয়ার ভাই মেরিয়াকে ভিয়েনা থেকে নেপোলিয়নের কাছে নিয়ে এলেন।

মেরিয়া আসতে নেপোলিয়নের মন সতেজ হয়ে উঠল। মেরিয়া নিজে একটি আলাদা ঘরে থাকতেন। তাঁর ঘরখানা ছিল সম্পূর্ণ নব সাজে সজ্জিত তার পাশেই ছিল নেপোলিয়নের শয়ন কক্ষ। নেপোলিয়ন যখন কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন মেরিয়া নিজে পড়াশুনা বা সেলাইয়ের কাজে মনোনিবেশ করতেন। নেপোলিয়ন অবসর পেলেই

মরিয়ার সাথে খোস মেজাজে গল্পে মেতে উঠতেন। চূড়ান্ত ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ পেতো তাঁর মধ্যে। এখন মেরিয়া ও আর নেপোলিয়নকে এড়িয়ে চলার কথা চিন্তায় করেন না। নেপোলিয়নকে উষ্ণ ভালবাসার ডোরে তিনি আবদ্ধ করে রেখেছেন।

মেরিয়া এখন মনে মনে গর্বিত এ ভেবে যে ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সম্রাটের প্রণয়িনী তিনি। নেপোলিয়ন মেরিয়াকে সোহাগের সুরে বলতেন যে, এটা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান যে ইয়োরোপের এমন একটি জাতির ওপর তাঁর কর্তৃত্ব করার সুযোগ এসেছে যেখানে রয়েছে মেরিয়ার মত রূপসী ও গুণবতী মেয়ে। নেপোলিয়ন আবেগভরে বলে যেতেন এতদিন তিনি ছিলেন মেরিয়ার কাছে একটি ওকবৃক্ষের বীজ স্বরূপ। এখন তিনি একটি শক্তিমান ওক বৃক্ষে পরিণত হয়েছেন। নেপোলিয়নের এ সমস্ত কথা মেরিয়াকে অত্যন্ত আনন্দ দিত। মনে পেতেন অস্বাভাবিক তৃপ্তি।

নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডে পোল্যাণ্ডবাসীদের দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার ব্যবস্থা করে দিলেন। পোলিশ সেনাদলকে সুগঠিত করলেন। এ সময় ফ্রান্সে যাবার জন্য তাঁর ডাক এল। তিনি পোল্যাণ্ডের হয়ে ফরাসী সৈন্যদের আর রক্ত ঝরাতে অনীহা প্রকাশ করলেন। কর্তব্যের টানে তাঁকে ফ্রান্সে ফিরতে হচ্ছে। কিন্তু মেরিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি মেরিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "I love your country……but my first duty is to France."

নেপোলিয়ন আড়াইমাস পোল্যাণ্ডে কাটালেন। মেরিয়ার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তম হয়ে গিয়েছিল। বসন্তকালে নেপোলিয়ন যখন দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত মেরিয়া তখন নেপোলিয়নকে একটি আংটি প্রদান করলেন যার মধ্যে লেখা ছিল। "when you ceased to love me, remember I love you still."

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। মেরিয়া নেপোলিয়নের

চিন্তায় কাতর—গভীর মনোবেদনায় ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিষণ্ণ। তাঁর হৃদয়ে যখন নেপোলিয়নের জন্য প্রেমের জোয়ার বইতে আরম্ভ করেছে সে সময় নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ড ছেড়ে স্বদেশে পাড়ি দিলেন। নেপোলিয়নের সাথে মেরিয়ার এ বিচ্ছেদ বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক। প্রেমের অন্তিম পরিণতি দৈহিক মিলনে এটা স্বীকার করেও বলতে হয় প্রেমের গভীরে মানুষের সুকোমল মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিও লুক্কায়িত থাকে। যাকে বলা যায় প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন, যা মেরিয়া ও নেপোলিয়নের হৃদয়রাজ্য জুড়ে বিরাজমান ছিল।

নেপোলিয়ন প্যারিসে গিয়ে জানতে পারলেন মেরিয়া সন্তানসম্ভবা একথা জানারপর নেপোলিয়ন মেরিয়াকে প্যারিসে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। মেরিয়া ১৮০৮ সালে জানুয়ারী মাসে ভ্রাতার সঙ্গে নেপোলিয়নের নির্দেশে প্যারিসে এসে হাজির হলেন।

নেপোলিয়ন মেরিয়ার জন্য একটি সুসজ্জিত অট্টালিকার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তারকে নিয়মিত ভাবে মেরিয়াকে দেখাশুনা করার জন্য নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন পরিচারিকাদের যাতে মেরিয়ার কোন অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য নেপোলিয়নের, দুর্ভাগ্য মেরিয়ার। এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মেরিয়া মা হতে পারলেন না। সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। মেরিয়া এসময়ে সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তুইলারির প্রাসাদে তিনি প্রায় প্রতিরাতেই দেখা করতে যেতেন। অল্পদিনের মধ্যেই নেপোলিয়নের আবার জয়যাত্রা শুরু হল। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

অষ্ট্রীয়াকে ওয়ারগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত করে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা অধিকার করলেন। ভিয়েনার স্কোনবর্ণ (Schonborn) রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতে থাকেন। শীঘ্রই প্যারিস থেকে মেরিয়াকে নেপোলিয়নের কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হল। নেপোলিয়ন তাঁর জন্য সুন্দর একটি কুটীর তৈরী করে দিলেন।

নেপোলিয়ন তিন মাস ভিয়েনায় ছিলেন এবং এ তিন মাস নিয়মিত ভাবে মেরিয়ার সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল। এটাই মেরিয়ার সাথে নেপোলিয়নের প্রণয়ের শেষ পর্বায় বলা যেতে পারে। এর মধ্যে মেরিয়া আবার সন্তান সম্ভবা হলেন।

নেপোলিয়ন আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। প্যারিসে ফিরে এসে নেপোলিয়ন তাঁর একটি বৈধ সন্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু যোসেফাইনের সন্তান-সম্ভবা হবার কোনও সম্ভাবনা যে নেই, সেটা নেপোলিয়ন ভালোভাবেই জানতেন। তাই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জনগণের অনুরোধে এবং নিজের উত্তরাধিকারীর কথা চিন্তা করে নতুন ভাবে দার পরিগ্রহ করবার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। এর মধ্যে অবশ্য আরও একটি কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে ইয়োরোপে নেপোলিয়ন একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্রাটের সাথে মিতালি স্থাপন করতে চাইছিলেন। কেননা তখন সমগ্র ইয়োরোপ নেপোলিয়নের বিপক্ষে। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্যের বাণী ইয়োরোপের এক-নায়কদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই নেপোলিয়ন ইয়োরোপের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করলেন বিবাহের সূত্র ধরে। মেরিয়া ল্যুইসাকে নেপোলিয়ন বিয়ে করেছিলেন মূলত দুটি কারণে। প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ ল্যুইসার গর্ভে ফ্রান্সের ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম দেওয়া। অবশ্য মেরিয়া লুইসার কাছ থেকে নেপোলিয়ন তাঁর প্রত্যাশিত স্ত্রীর ভালবাসা পানানি। তাঁর ভাল-বাসার মধ্যে গভীরতা ছিলনা, ছিল বাহ্যিক লোক দেখানো প্রীতির নিদর্শন।

মেরিয়া লুইসা ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের কন্যা। মার নাম মেরিয়া থেরেসা। মেরিয়া থেরেসা ছিলেন নেপলসের রাজা চতুর্থ ফার্ডিন্যাণ্ডের কন্যা। আবার অন্যদিক থেকে মেরিয়া থেরেসা ফ্রান্সের সম্রাট ত্রয়োদশ ল্যুইর আত্মীয়া ছিলেন। সেদিক থেকে

দেখতে গেলে মেরিয়া থেরেসার শরীরে বুরবোঁ সম্রাটের রক্তও প্রবাহিত হত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে রক্ত মেরিয়া ল্যুইসার ধমনীতেও প্রবাহিত হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

হ্যাপসবার্গ বংশের শিক্ষা রীতি নীতি ল্যুইসার চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়, ছোটবেলা থেকেই গান বাজনা ও অঙ্কন শিল্পে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মে। তিনি অনেকগুলি ভাষাও শিক্ষালাভ করেছিলেন। নেপোলিয়নের সাথে তাঁর যখন বিয়ে হয় সে সময় তিনি বহু বৈদেশিক ভাষায় পারদর্শীতা লাভ করেন। নেপোলিয়নের সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯। ল্যুইসার মানসিক ও শারীরিক দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে Benjamin Constant উল্লেখ করেছেন যে, "The Empress Maria Louisa was nineteen years of age when she married Napoleon. Her hair was of light colour her eyes blue and expressive, her walk noble, and her figure imposing"..........Healthy hues and florid Complexion were joined to great timidity ; the latter occasioned the empress appeared to be haughty before the ladies of the court, but in private she was amiable and even affectionate"

নেপোলিয়নকে বিয়ে করার তাঁর বিন্দু মাত্র ইচ্ছে ছিল না। নেপোলিয়নের সাথে তাঁর যখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হল তখন তিনি মনে করলেন এ যেন জোর করে তাঁর মত রক্ত মাংসের একজন রূপসী মেয়েকে রাক্ষসের মুখে খাবারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। রূপকথার সে সব কাহিনী তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারের স্বার্থে এবং তাঁর পিতার নির্দেশে এ বিয়েতে সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন।

অন্যদিকে রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ও তাঁর বোনের সাথে নেপোলিয়ানের বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন (তাদের সহোদর বোন

-নয়)। নেপোলিয়নেরও এতে অসম্মতি ছিল না। কেননা প্রথমে প্রস্তাবটা তিনিই জারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য জারের এই ভগ্নী বয়সে তখন নাবালিকা। এরকম বয়সে বিয়ে দেওয়াটা তখনকার দিনে ইয়োরোপের আইনসিদ্ধ ছিল না। তথাপি নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডার পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এ বিয়েতে দুইজনেই সম্মতি দিলেন।

পাত্রীর মা অবশ্য এ বিয়েতে পাত্র নেপোলিয়নের ওপর কতকগুলি সর্ত আরোপ করতে থাকলেন। সে সব সর্ত নেপোলিয়নের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এব্যাপারে অযথা কালক্ষেপ করা নেপোলিয়ন যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। দশদিনের সময় দিয়ে নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের কাছে চিঠি পাঠালেন। দশদিনের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে চিঠির কোন উত্তর এলো না। নেপোলিয়নের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

নেপোলিয়ন তাঁর বিদেশ মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরিয়া ল্যুইসার সাথে যেন অতি সত্বর তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। যথারীতি কাজও সমাধা হলো। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও নেপোলিয়নের এসম্মতির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই (মাত্র ১মাসের মধ্যে) বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

উভয় পক্ষেই marriage contact এ স্বাক্ষর দিলেন। ১৮১০ সালে ১১ই মার্চ ভিয়েনাতে আনন্দোৎসবের মধ্যে বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হল। পরের দিনই সম্রাট সম্রাজ্ঞী ল্যুইসাকে নিয়ে প্যারিসে রওনা হলেন। ১৬ই মার্চ ফ্রান্সের অ্যালথিয়েম (Altheim) নামক একটি গ্রামে সম্রাট নববধূসহ এসে উপস্থিত হন। নেপোলিয়নের ভগ্নী ক্যারোলিন (Caroline) ও তাঁর স্বামী মুরাট বর কনেকে আশীর্বাদ করলেন। ফ্রান্সের বহু গণ্যমান্য লোক এসে ছোট্ট গ্রামটিতে জড়ো

হলেন। এলেন মেজ (Metz) এর বিশপ।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে ফ্রান্সের আপামর জনসাধারণ আনন্দে মেতে উঠল। সেন্ট ক্লয়েড থেকে তুইলারির প্রাসাদ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ জনতা নবদম্পতিকে দামী উপহার দেবার জন্য বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবদম্পতির গাড়ী জনতার সামনে দিয়ে যাবার সময় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে ফ্রান্সের জনগণ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল। চিন্তা করতে লাগল নেপোলিয়নের ভাবী উত্তরাধিকারীর কথা অর্থাৎ ফ্রান্সের ভাবী সম্রাটের কথা।

১৮১০ সালের ১লা এপ্রিল। জাকযমকপূর্ণ আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে প্যারিসে ও নেপোলিয়নের আবার ফ্রান্সের রীতি অনুযায়ী বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হল। আগে ভিয়েনাতে অষ্ট্রীয়ার রীতি অনুযায়ী দুজনের মধ্যে বিয়ে হয়েছিল। প্যারিসে এসে নতুন করে আর এই অনুষ্ঠান করার কোন যুক্তি ছিলনা। তথাপি ফ্রান্সের জনগণের সন্তুষ্টির জন্য নেপোলিয়ন পুনঃরায় প্যারিসে ফ্রান্সের রীতি অনুযায়ী আবার বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করলেন। পরদিনই কার্ডিন্যাল ফেচ্ (Cardinal Fesch) এসে রোমান চার্চের রীতি অনুযায়ী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে বরণ করলেন।

২৭ শে এপ্রিল নেপোলিয়ন ল্যুইসাকে নিয়ে ফ্রান্সের উত্তরপ্রান্তে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য গমন করলেন। প্যারিসের জনসাধারণকে আনন্দের আতিশয্য থেকে ক্ষণিকের জন্য নিবৃত্তি করার মানসেই যেন নেপোলিয়ন প্রমোদ ভ্রমণে বের হলেন নববধূসহ। J.S.C. Abbott বলেছেন "On the 27th April, the emperor and Empress set out on a tour through the northern departments, to give the good city of paris time to breathe."

মেরিয়া ল্যুইসা প্যারিসের জনগণের এত আদর, স্নেহ ভালবাসা ও অভ্যর্থনায় অভিভূত না হয়ে পারলেন না। কিন্তু এ সময়ে এক অদ্ভুত

ঘটনা ঘটে গেল। মেরিয়া ল্যুইসা ত্যুইলারির প্রাসাদে ঢুকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন অবশ্য সকলের অলক্ষ্যে। ইম্পিরিয়েল কমিশনার বার্থিয়ার ত্যুইলারির প্রাসাদে ঢুকলেন। ল্যুইসাকে তাঁর শকটে তুলে দিতে সাহায্য করার জন্যই বার্থিয়ার প্রাসাদে ঢুকেছিলেন। ঢুকেই বার্থিয়ার বিস্মিত হয়ে গেলেন। এত আনন্দের মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত অথচ করুণ দৃশ্য অবলোকন করলেন। দেখলেন ল্যুইসা অঝোরে কাঁদছেন। কারণ নিরূপণ করা বার্থিয়ারের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বার্থিয়ারকে দেখে ল্যুইসা লজ্জা পেলেন। বলে উঠলেন যে তাঁর এ মানসিক দুর্বলতা ক্ষণিকের জন্য। তাঁর জন্য তিনি লজ্জিতা ও ক্ষমা-প্রার্থিনী। তারপর তিনি খুলে বললেন যে, পিতৃগৃহে তিনি তাঁর এতদিনের যে সমস্ত ভালবাসা ও আদরের সামগ্রী ফেলে এসেছেন যার মধ্যে রয়েছে তাঁর বিবিধ শিল্পকলা, তাঁর আদরের পশুপাখি, তাঁর ছোট্ট পোষা কুকুর, তাঁর স্বদেশের বন্ধু-বান্ধব, সর্বোপরি তাঁর পিতামাতা, এ সবের চিন্তায় তিনি হঠাৎ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এবং নিজেকে সামলাতে পারেননি। ভাবাবেগে তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। তিনি আরও বললেন—ফ্রান্সের জনগণের স্নেহ ভালবাসা ও অভ্যর্থনা তাঁর মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে—তাতে তিনি অবিলম্বে তাঁর পূর্বস্মৃতি ভুলে যেতে পারবেন এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

এমন সময় নেপোলিয়ন প্রাসাদে ঢুকে ল্যুইসাকে অত্যন্ত স্নেহের কণ্ঠে ডাকলেন। প্রাসাদের ভেতরে একটি সুসজ্জিত কামরায় নেপোলিয়ন ল্যুইসাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কেউ নেই। ল্যুইসা দেখলেন তাঁর সেই কক্ষ দারুণভাবে সজ্জিত। সেখানে রয়েছে অপূর্ব শিল্পসমৃদ্ধ কারুকর্ম, রয়েছে অপূর্ব সব পশুপাখি, এমনকি ল্যুইসার ছোট্ট কুকুরটির মত একটি কুকুরও রাখা হয়েছে। সে কক্ষে প্রবেশ ক'রে ল্যুইসার মনে পড়ল পিতৃগৃহের তাঁর সে সুসজ্জিত কক্ষের কথা—যেখানে ল্যুইসা ছোটবেলা

থেকে বড় হয়েছেন। দেখতে পেলেন পিতৃগৃহের তাঁর সে সুসজ্জিত কক্ষের সাথে এ কক্ষের কোন অমিল নেই—বরঞ্চ কোন কোন দিক থেকে উৎকৃষ্টও বটে। এমনকি ছোট কুকুরটির সম্ভাষণ পূর্ণ ডাকে তিনি বিগলিত, মুগ্ধ। এ যেন তাঁর বাপের বাড়ির সেই ছোট্ট পোষা কুকুরটি এখানে এনে রাখা হয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে ল্যুইসার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। নেপোলিয়নের বাহুতে নিজের দেহকে এলিয়ে দিয়ে সোহাগের সুরে বললেন নেপোলিয়ন তাঁকে যে গভীর ভালবাসার নিদর্শন দেখালেন তাতে তিনি বিমোহিত, মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। ল্যুইসার মিষ্ট মধুর ব্যবহার, তাঁর উপভোগ্য শারীরিক গঠন, অপূর্ব মুখশ্রী সব মিলে নেপোলিয়ন মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁর অন্তরঙ্গ লোকদের বলতেন, **"You should all marry Germans. They are gentle, good, unspoiled and as fresh as roses."**

নেপোলিয়ন মেরিয়া ল্যুইসাকে বিয়ে করার কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে খবর এল যে ওয়ালউইসে মেরিয়া ওয়ালাস্কার একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে। এটা যে নেপোলিয়নেরই সন্তান সে ব্যাপারে নেপোলিয়ন বা পোল্যাণ্ডবাসীর কারো কোন সন্দেহই রইল না। পুত্র সন্তানটির নাম রাখা হয়েছে আলেকজান্দ্রা ওয়ালেস্কি, নেপোলিয়ন তাকে কাউন্ট পদে ভূষিত করবার সংকল্প করলেন।

মেরিয়া ওয়ালাস্কার পুত্রসন্তান জন্মলাভের খবর নেপোলিয়নকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলল। মনে পেলেন এক অস্বাভাবিক শান্তি। এত ব্যস্ততার মধ্যেও নেপোলিয়ন আনন্দে ও মানসিক তৃপ্তির চরম উত্তেজনায় মেরিয়ার কাছে নির্দেশ পাঠালেন মেরিয়া যেন পুত্রসহ অবিলম্বে প্যারিসে চলে আসেন।

মেরিয়া অনতিবিলম্বে নেপোলিয়নের কাছে এসে দেখা করলেন।

ত্যুইলারির রাজপ্রাসাদে নেপোলিয়ন মেরিয়া ও পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আনন্দে নেপোলিয়নের মন ভরে গেল। নেপোলিয়ন পুত্রকে পোল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাটরূপেও কল্পনা করে রাখলেন এবং তিনিই যে তাকে সে পদে অভিষিক্ত করবেন সে কথাটিও তিনি মেরিয়ার কাছে গোপন রাখলেন না। মেরিয়াকে মাসিক ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক করে ভাতা দেওয়ার কথা ও তিনি ঘোষণা করলেন।

মেরিয়া ওয়ালাস্কা ও পুত্র আলেকজান্দ্রাকে (Alexandre) নেপোলিয়ন ল্যুইসার কাছে পাঠালেন। ল্যুইসা জানতেন না মেরিয়া ওয়ালাস্কার সাথে নেপোলিয়নের কি বা সম্পর্ক এবং শিশু সন্তানটিও বা কার। ল্যুইসা ওয়ালাস্কা ও তাঁর পুত্রকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করলেন।

তখন ম্যালমাইসেনের নির্জন প্রাসাদে যোসেফাইন একাকিনী জীবন যাত্রা নির্বাহ করছেন। যোসেফাইনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে মহীয়সী যোসেফাইন মেরিয়া ওয়ালাস্কা এবং নেপোলিয়ন পুত্র আলেকজান্দ্রাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। যোসেফাইনের অনুরোধে মেরিয়া পুত্র আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে যোসেফাইনের কাছে হাজির হলেন। যোসেফাইন তাঁদের সাদরে গ্রহণ করলেন। নেপোলিয়ন পুত্র আলেকজান্দ্রাকে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওয়ালাস্কা হতবাক। কারো মুখে কোন কথা নেই। যোসেফাইন তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ওয়ালাস্কাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলেন। নেপোলিয়নের ওপর অভিমানে ও ক্ষোভে তাঁর বক্ষ যেন বিদীর্ণ হচ্ছিল।

বেদনায় যোসেফাইনের বুক ফাটলেও মুখ ফাটল না। নেপোলিয়নের নামে তিনি একটুকু কটূক্তি করলেন না। বরঞ্চ নেপোলিয়নের তাঁর প্রতি এত নির্দয় আচরণ সত্ত্বেও নেপোলিয়নকে যে যোসেফাইন তখনো গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন সে কথাও ওয়ালাস্কাকে জানালেন।

যোসেফাইনের স্বভাব-সুলভ ভদ্রতা, সৌজন্য, আন্তরিক স্নেহপ্রীতি, নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর তখনো পর্যন্ত এত গভীর শ্রদ্ধা—এ সব দেখে ওয়ালাস্কা বিস্ময়ে হতবাক। তিনি বুঝতে পারলেন মহীয়সী যোসেফাইন স্ত্রী জাতির আদর্শ স্বরূপিনী।

এর চার বৎসর পর মেরিয়া ওয়ালাস্কা নিজের দেশ পোল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। পুনর্মিলন ঘটল স্বামী কাউণ্ট ওয়ালেস্কির সাথে। ওয়ালউইসে আবার তাঁদের সে পূর্বের জীবন শুরু হল। স্বদেশে তিনি নেপোলিয়নের পোলিশ স্ত্রীরূপে পরিচিতা ছিলেন। Irving Wallace বলেছেন "Throughout her home land she was a legend —Napoleon's "polish wife" and even the great patriot Thaddeus kosciusko, called upon her to pay homage."

ফ্রান্সের জনগণ সম্রাজ্ঞী হিসেবে যোসেফাইনের মধ্যে যে সব গুণের পরিচয় পেয়েছিল, মেরিয়া ল্যুইসার মধ্যে তার প্রচুর ঘাটতি ছিল। মেরিয়া ল্যুইসার শীতল ব্যবহার ফ্রান্সের জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ল্যুইসার মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে কৃত্রিমতায় ছিল বেশী। যোসেফাইনের মধ্যে ছিল গভীর আন্তরিকতা—আর ফরাসী জনগণের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ও প্রাণভরা ভালবাসা। ল্যুইসার মধ্যে তার কণামাত্রও ছিল না।

যোসেফাইনের আমলে ফরাসী জাতীয় জীবনে সার্বিক উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কি বিজ্ঞান, কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা-দীক্ষা—সব দিক থেকে যেন যোসেফাইনের স্পর্শ ফরাসী জাতিকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। মা যেমন সন্তানকে তিল তিল করে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলেন—সন্তানের সুখদুঃখ, হাসিকান্না যেমন মায়ের মনে দোলা লাগে, সন্তানের ঐশ্বর্যে মায়ের মন যেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে—তদ্রূপ ফরাসী জনগণের মঙ্গলামঙ্গলে যোসেফাইনের মনেও যুগপৎ আনন্দ ও বেদনায় ভরে উঠত।

এ যেন সন্তানের প্রতি মার অপার স্নেহ ভালবাসার নিদর্শন।

সত্যি যোসেফাইন ছিলেন একদিকে ফরাসী সম্রাজ্ঞী আর একদিকে ফরাসী জনগণের প্রকৃত মা। J. S. C. Abbott তাই যথার্থই বলেছেন, "In Maria Louisa the country had an Empress, but the people of France had no longer a mother."

অল্পদিনের মধ্যে মেরিয়া ল্যুইসার ব্যবহারে ফরাসী জনগণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল। যোসেফাইনকে সম্রাজ্ঞী হিসেবে তারা আর পাবে না—এ ভেবে তারা বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগল। মাতৃহারা নাবালক সন্তান যেমন অসহায় বোধ করে—ফরাসী জনগণও যোসেফাইনকে সম্রাজ্ঞী পদে দেখতে না পেয়ে বড় বিষণ্ণ ও বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের ইচ্ছেতেই এবং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর কথা চিন্তা করে নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে রাজমহীষীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে ল্যুইসাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

২০শে মার্চ ১৮১১ সাল। মেরিয়া ল্যুইসা প্রসব বেদনা অনুভব করলেন। ল্যুইসার অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। ডঃ ডিউবইস (Dr. Dubois) সারাক্ষণ ল্যুইসার শয্যাপাশে ছিলেন। ডাক্তার অনেক চিন্তাভাবনা করলেন। বুঝতে পারলেন মা ও ছেলে দুজনকে হয়ত বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি নেপোলিয়নের কাছে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। এমতাবস্থায় তিনি কি করবেন?

নেপোলিয়ন ডাক্তারকে বলে দিলেন তিনি যেন মাকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ছেলের জন্য চিন্তা করার ফুরসৎ তখন নেপোলিয়ন হারিয়ে ফেলেছেন। সৌভাগ্যক্রমে মা ও ছেলে দুজনেরই জীবন রক্ষা পেল। পুত্রের নাম রাখা হল যোশেফ চার্লস।

ফ্রান্সের ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্মের খবর যেন হাওয়ায় বয়ে নিয়ে গেল সমস্ত ফরাসী জনগণের কাছে। তারা সবকিছু ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠল। একজন আর একজনকে ধরে আনন্দের আতিশয্যে কোলাকুলি করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মনে হতে

লাগল যেন তাদের নিজেদেরই ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। একজন ফরাসী লেখক এই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'They embraced and kissed each other in the Street— grasped each other's hands, as if a child was born to each one."

নেপোলিয়ন পেয়েছেন ফ্রান্সের ভাবী উত্তরাধিকারী বৈধ সন্তান। নাম দেওয়া হয়েছে যোসেফ চার্লস। পরবর্তী সময়ে ডিউক অব রাইখষ্ট্যাড্ নামে পরিচিত হন। কিন্তু নেপোলিয়নের এ সন্তান বেশিদিন পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পাননি। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তখন নেপোলিয়নও আর ইহলোকে ছিলেন না। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, দুঃখ-পূর্ণ ২১ বৎসর জীবনযাপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী—তাঁর বৈধ সন্তান। বিধির নিষ্ঠুর পরিহাসে ফ্রান্সের বহু আকাঙ্ক্ষিত নেপোলিয়নের ভাবী উত্তরাধিকারীর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

নবকুমারের জন্মের খবরে যোসেফাইন সাতিশয় আনন্দলাভ করে-ছিলেন। নেপোলিয়নের কাছে দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে নবকুমারের মঙ্গল কামনা করলেন। তবু নারী হৃদয়ে নিজের অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। যোসেফাইন ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেলেন। ভাবছেন দু বৎসর আগে তাঁর কোলে এরকম একটি রত্ন যদি বিধাতা দিতেন তাহলে ও সম্রাট তাঁকে এভাবে পরিত্যাগ করতেন না। মানুষ ত ভগবানের হাতের ক্রিড়ণক ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব বিধির বিধান খণ্ডন করার ক্ষমতা মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ চিন্তা করেই যোসেফাইন নিজেকে আশ্বস্ত করলেন।

নেপোলিয়নের পুত্রকে দেখার জন্য তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। পুত্র সন্দর্শনে যোসেফাইন পরিতৃপ্ত। কিন্তু মেরিয়া ল্যুইসা যোসেফাইনকে একমুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারতেন না। তাই

যোসেফাইনকে ল্যুইসার চোখের আড়ালেই থাকতে হতো। নেপোলিয়ন মহীয়সী যোসেফাইনকে জানতেন, তাঁকে এখনো তাঁর হৃদয়ের অপার ভালবাসার ধন বলে মনে করেন। পুত্রের জন্মের পর যোসেফাইনকে যে দীর্ঘ চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এটা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে ফ্রান্সের সিংহাসনের ভাবী সম্রাটের শিক্ষা-দীক্ষা লালন পালনের বেশ খানিকটা দায়িত্ব যোসেফাইন পুত্র ইউজিনকেই বহন করতে হবে। চিঠিতে নেপোলিয়ন উল্লেখ করলেন **"This in fact, in concert with our Eugene, will constitute my happiness and that of France."**

এই চিঠি যোসেফাইন নিজে পড়েছেন বারবার। অশ্রুতে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। জোরে জোরে বান্ধবীদের চিঠিখানা পড়ে শুনিয়েছেন। আর ভেবেছেন নেপোলিয়ন তাঁকে এখনো কত ভালবাসেন—এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পাওনা।

ছেলে ক্রমে বড় হতে লাগল। নেপোলিয়ন তার শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন—মাদাম মন্তেস্কোর ওপর। মাদাম মন্তেস্কো ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী। উচ্চশিক্ষিতা, উচ্চ বংশোদ্ভূতা মহিলা। চারিত্রিক দিক থেকে তিনি ছিলেন তৎকালীন প্যারিসের আদর্শস্থানীয়া নারী। তাই নেপোলিয়ন আশা করেছিলেন তাঁর পুত্রের চরিত্র গঠনে মন্তেস্কোর শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ ফলদায়ী হবে। রাজকুমার ও শিক্ষয়িত্রী মন্তেস্কোকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি করত। ভয়ও পেত। প্রাসাদ বাতায়নে রাজকুমারকে দেখার জন্য সময় সময় প্রভূত লোক সমাগম ঘটত রাস্তায়।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রাজকুমার হঠাৎ ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে উঠলেন। গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকেরা রাজকুমারের এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মন্তেস্কো তাকে শান্ত করার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। অন্যকোন উপায় না দেখে মন্তেস্কো ঘরের

সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকার গৃহে শিশু রাজকুমারকে একাকী থাকতে বাধ্য করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকুমারের ক্রোধ প্রশমিত হল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজকুমার মাদাম মন্তেস্কোকে জিজ্ঞেস করল—মামনকুই (শিক্ষয়িত্রীকে রাজকুমার এ নামেই ডাকত) কেন এভাবে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে তাকে অন্ধকার ঘরে থাকতে বাধ্য করলেন।

মন্তেস্কো অত্যন্ত স্নেহের সুরে রাজকুমারকে বললেন ভবিষ্যতে রাজকুমার ফ্রান্সের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হবে। আর যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তারা হবে তার প্রজা। প্রজারা যদি রাজকুমারের এ অবস্থা অবলোকন করে তাহলে তার ওপর প্রজাদের কি ধারণা হবে? তারা কি তখন সম্রাটের ছোটবেলাকার এ সমস্ত কথা স্মরণে এনে তাকে কিছুটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখবে না। রাজকুমারকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সেজন্যই তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে তার ক্রুদ্ধ মূর্তিটি দেখতে দিতে চাননি। তাই তিনি এভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাজকুমারকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছেন।

নেপোলিয়ন এটা জানতে পেরে অতীব প্রীত হন। নেপোলিয়ন এ ব্যাপারে ল্যুইসাকে বলেছিলেন মন্তেস্কোর সাথে পঞ্চদশ ল্যুইর ছোটবেলার শিক্ষয়িত্রী ভিলেয়রির অনেক তফাৎ। ভিলয়রির শিক্ষায় পঞ্চদশ ল্যুইর ভবিষ্যৎ জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়ে উঠেছিল। ভিলয়রি সব সময় পঞ্চদশ লুইকে ফ্রান্সের জনগণকে দেখিয়ে বলতেন —যে তারা হচ্ছে লুইর প্রজা। তার অধীন। এবং ভবিষ্যতে তার হুকুমেই ফ্রান্সের এসব জনসাধারণ পরিচালিত হবে।

এ সমস্ত কথা ছোট্ট ল্যুইর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করত। ফলে ছোটবেলা থেকেই ল্যুইর মধ্যে একটি ঔদ্ধত্যের ভাব পরিলক্ষিত হতো। যা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের জন্য পঞ্চদশ ল্যুইর কার্যকলাপও কম দায়ী নয়। তিনি বলতেন "After me the deluge" অর্থাৎ "আমার পরই ফ্রান্সে প্লাবন

আসবে।" সত্যি পঞ্চদশ ল্যুইর মৃত্যুর পরই ফ্রান্সের আকাশে বিপ্লবের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ফরাসী সম্রাজ্ঞী মেরী অ্যান্টনিয়েট ও সম্রাট ষোড়শ ল্যুইকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল। ব্যাস্টিল প্রাসাদ ধ্বংস করে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে টেনেহিঁচড়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে গিলোটিনে প্রাণসংহার করল ফরাসী জনতা ও সন্ত্রাসের রাজত্বের মালিক রোবসপীয়ার।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী হিসেবে মেরিয়া ল্যুইসা কোন কৃতিত্বের অধিকারিণী হতে পারেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির মেয়েছেলে। যার ফলে তিনি ফ্রান্সের জনগণের কাছ থেকে কোন সমাদর লাভ করতে পারেননি। ১৮১০-১৮১৪ সাল পর্যন্ত ফরাসী সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। নেপোলিয়ন দুবার তাঁকে তাঁর রিজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমবার রুশদেশ আক্রমণের সময়, রিজেন্ট হিসেবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অযোগ্য।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নকে রুশদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রুশদের সাথে যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল পোল্যাণ্ড। ওয়ারস থেকে কোশাকদের বিতাড়িত করার জন্য নেপোলিয়ন বীর-বিক্রমে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। পোলিশরা সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়নের পতাকাতলে এসে উপস্থিত হল। তারা তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য নেপোলিয়নের নির্দেশে প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য তৈরি ছিল।

এরকম মহাসমরের সময়ও নেপোলিয়ন মেরিয়া ওয়ালাস্কার কথা ভুলতে পারেননি। তিনি ক্ষণিকের জন্য ওয়ারসতে অপেক্ষা করে মেরিয়া ওয়ালাস্কার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছে পূরণ হয়নি।

মেরিয়া ল্যুইসার সঙ্গেও নেপোলিয়নের বিচ্ছেদের দিন আগত প্রায়। ইয়োরোপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধে নেপোলিয়নের

পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। বিশেষত তাঁর রাশিয়া আক্রমণের পর থেকে তাঁর পতনের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত শক্তির কাছে নেপোলিয়নকে পরাজয় বরণ করতে হল। তাঁকে পাড়ি দিতে হল ফ্রান্স থেকে ১০০ ক্রোশ দূরে এল্‌বা দ্বীপে।

রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়া এই চারটি বৃহৎ শক্তি নেপোলিয়নকে এল্‌বা দ্বীপে পাঠাবার জন্য নিজ নিজ দেশের দূতদের নিযুক্ত করলেন। তাঁরা নেপোলিয়নের সাথে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পাঠাবারও সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁদের ভয় ছিল ফরাসীদেশের পূর্ব ও মধ্যভাগের অধিবাসীরা নেপোলিয়নকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। হয়ত নেপোলিয়নকে এল্‌বায় নিয়ে যাবার সময় তারা বিদ্রোহী হয়ে নেপোলিয়নকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আবার ফ্রান্সের দক্ষিণে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধমতাবলম্বীর সংখ্যাও কম ছিল না। সেখানকার লোকেরা সুযোগ পেলে নেপোলিয়নের প্রাণ সংহার করার চেষ্টার কসুর করবে না।

এই সমস্ত কথা চিন্তা করে সম্রাট চতুষ্টয় নেপোলিয়নের সাথে একটি বিরাট বাহিনী পাঠাবার কথা চিন্তা করলেন। নেপোলিয়নের অনেক অনুগামীও এল্‌বা দ্বীপে যেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। নেপোলিয়ন কিন্তু ৪০০ জনের অধিক সৈন্য বা সাথী নিয়ে যেতে পারবেন না। এটা ছিল তাঁর ওপরে নির্দেশ। যে এতদিন অন্যকে নির্দেশ দিয়ে এসেছেন এখন তাঁকে অন্যের নির্দেশে চলতে হচ্ছে।

নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসনে যাবার দিন আগত প্রায়। এমন সময় একদিন একজন ফরাসী বীর সৈনিক এসে নেপোলিয়নকে বললেন তিনি সপরিবারে নেপোলিয়নের সাথে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসনে যেতে চান। কিন্তু নেপোলিয়ন এ ব্যাপারে একটু ইতস্তত করছিলেন —বীর ফরাসী সৈনিক নেপোলিয়নকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তিনি সপরিবারে তাঁর সাথে এল্‌বা দ্বীপে যাবেন নচেৎ আত্মহত্যা

করে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। নিরুপায় হয়ে নেপোলিয়ন উক্ত সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

এদিকে মেরিয়া ল্যুইসা প্যারিস থেকে অনেক দূরে ব্লইস নামক একটি জায়গায় বসবাস করছেন। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। ল্যুইসার বয়স তখন মাত্র ২২ বৎসর। ১৮১০ সালে বিয়ে হলো ১৮১৪ সালে সম্রাটের সাথে তাঁর বিবাহিত জীবনের যবনিকাপাত হল।

সম্রাট প্রথমে মেরিয়াকে এল্‌বা দ্বীপে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু মেরিয়া ল্যুইসার বিশেষ কোন সম্মতি তাতে ছিল না। মেরিয়া ল্যুইসা সম্রাটের পতনের কথা অবগত হয়ে প্রথমে বিশ্বাস কবতে পারেননি। কেননা তাঁর পিতা অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে—সম্রাটের বিপদের সময় তাঁর পিতা সম্রাটের পাশে দাঁড়াবেন। অথচ তাঁর পিতাই সম্রাটের পতনের জন্য অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

হায় মূঢ় নারীহৃদয়। বুঝবার ভুলে "তোমার মানসিক যাতনা কত কঠোর হয়েছে ?" ২০শে এপ্রিল, ১৮১৪। নেপোলিয়ন তাঁর ৪০০ অনুচরসহ এবং অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সেনানী-মণ্ডলীর দ্বারা প্রহরারত ও বন্দী অবস্থায় এলবার পথে বিজয়ী সম্রাটদের নির্দেশে জাহাজযোগে যাত্রা করলেন। নেপোলিয়ন প্যারিসের জনগণকে নির্দেশ (বা উপদেশ যাই বলা হোক না কেন) দিয়ে গেলেন—তাঁরা যেন সম্রাটকে যেভাবে সেবা করেছে—ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে সম্রাটের কথায় দেশের স্বার্থে তারা যেমন বীরের মত মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি—বর্তমান ফরাসী সম্রাট অষ্টাদশ ল্যুইকেও যেন তারা সেভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তারা যেন সুশৃঙ্খলভাবে সম্রাট অষ্টাদশ ল্যুইকে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

নেপোলিয়নের আবেগপূর্ণ ও স্নেহার্দ্র কথা উপস্থিত জনগণের হৃদয় বিগলিত করল। সকলের চোখে অশ্রুধারা বইয়ে যেতে লাগল। যে

সমস্ত বীর সৈন্য ও সেনানায়ক সেখানে উপস্থিত ছিলেন—যাঁরা নেপোলিয়নের নির্দেশে কর্তব্যপালনে পাষাণের ন্যায় কঠোরভাব ধারণ করতেন—তাঁরাও আজ শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

সম্রাট নিজেই শোকে মুহ্যমান। বেদনায় কাতর হৃদয়ে আদেশ করলেন—যেন রাজচিহ্ন ঈগলকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। একজন সৈনিক ছুটে গিয়ে ঈগল নিয়ে এল। সম্রাট ঈগলের রৌপ্য নির্মিত চোখে স্নেহচুম্বন করলেন। ঈগলকে বক্ষে চেপে ধরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, "প্রিয় ঈগল, আমার এ অন্তিম আলিঙ্গন যেন চিরদিন আমার বিশ্বস্ত সৈনিকবৃন্দের হৃদয়তন্ত্রী বিকম্পিত রাখতে সক্ষম হয়; আমার পুরাতন সহযোগিবৃন্দ বিদায়, বিদায়।" এরকম করুণ দৃশ্য ইতিহাসে বিরল।

এলবা ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। ফরাসীভূমি থেকে ১০০ শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দৈর্ঘে মাত্র ১ মাইল এবং প্রস্থে ২½ থেকে ১০ মাইল। ১৩ হাজার লোকের বাস ছিল যখন নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে পদার্পণ করেন। ৪ঠা মে প্রাতে নেপোলিয়ন তাঁর জিনিসপত্র অনুচর ও অন্যান্য প্রহরীরা সহ এলবা দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। এলবার তটপ্রান্তে উপস্থিত হলে—এলবার রাজধানী পোর্টেরকে থেকে শতবার তোপধ্বনি করা হল।

নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে অবতরণ করে রাজপ্রাসাদে না গিয়ে উস্যার নামক একজন ইংরেজ সৈনিক কর্মচারীর সাথে একটি উচ্চ ভূখণ্ডের দিকে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পুরো এলবা দ্বীপটি অবলোকন করলেন। নেপোলিয়ন কৌতুকচ্ছলে তাঁর সহচরদের বললেন যে তাঁর নতুন সাম্রাজ্যটি অতি ছোট।

নেপোলিয়ন গভীর অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে পারলেন যে এলবার অধিকাংশ অধিবাসীই অশিক্ষিত। মূর্খ। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের দ্বারা প্রতারিত। তাদের হৃদয় রাজ্যে পশুর ভাবই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। নেপোলিয়ন এলবার অধিবাসীদের সার্বিক উন্নতি বিধানের

সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। তাঁর অশেষ কর্মক্ষমতা এবং বিচক্ষণ শাসনক্ষমতা গুণে এল্‌বার অধিবাসীদের মন তিনি অতি সহজে জয় করে ফেললেন। মনে হতে লাগল নেপোলিয়নের আগমনে এল্‌বা দ্বীপ একটি তীর্থস্থানের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এল্‌বাতে লোক সমাগম ঘটতে লাগল। ইয়োরোপের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এসে নেপোলিয়নকে তাঁদের অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করে গেলেন।

জুন মাসের প্রথমে নেপোলিয়নের মা মাদাম লেটিজিয়া ও ভগ্নী পলিন এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়নের সাথে কিছুদিন অতিবাহিত করবার জন্য ছুটে এলেন। ইচ্ছে ছিল নেপোলিয়নের কাছেই তাঁরা থাকবেন।

নেপোলিয়নের মন ক্রমে শান্ত ও সংযত হয়ে উঠল। তিনি দ্বীপের শ্রমজীবীদের সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মিশতে লাগলেন। ভগ্নী পলিন ও তাঁর মা সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার সাথে তিনি বসে বসে কত গল্পই না করতেন। নেপোলিয়ন পোর্টেরকের রাজপ্রাসাদের অনতি-দূরে একটি নতুন কৃষিখামার খুললেন। এখানে রাখলেন অনেক পশু পাখি। এদের তিনি নিজহস্তে খাওয়াতেন। নেপোলিয়নের জীবনে এক নতুন অঙ্ক অভিনীত হতে লাগল।

এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়ন কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর মনে ফ্রান্সের জন্য যত চিন্তায় থাকুক না কেন—কেউ কোনদিন তাঁকে বিষণ্ণ দেখেনি।

এভাবে গ্রীষ্মকাল অতিক্রান্ত হল। ইয়োরোপের সম্মিলিত রাজন্যবর্গ নববিজিত ফরাসী সাম্রাজ্যকে লুঠের সামগ্রীর ন্যায় ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য চিন্তা করতে লেগে গেলেন। কিন্তু সকলেই প্রায় সমপরাক্রান্ত। রক্তবর্ণচক্ষু ও বাহু আস্ফালনপূর্বক প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

ফ্রান্সের অযোগ্য অধিপতি অষ্টাদশ লুইর অপদার্থ শাসন ব্যবস্থায়

দেশে দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা, অষ্টাদশ লুইর বয়স তখন ৬০ এর ওপর। ক্ষমতা না থাকুক তাঁর গরিমা ছিল প্রচুর। বাক্ পটুতায় যেন তিনি বিশ্বজয় ক'রে ফেলবেন। এ ছিল তাঁর মনোভাব। পোষাক পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন বীরদর্পী সম্রাট। আসল কাজে ছিলেন একজন নিরেট বোকা।

ফরাসী জনগণ অষ্টাদশ লুইর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিল। তাই নেপোলিয়নের বিরহ ভুলে গিয়ে তারা অষ্টাদশ লুইকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। নেপোলিয়নের অনেক ভাবর তাবর সেনাপতি নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অষ্টাদশ লুইকে জানিয়ে ছিলেন তাঁদের সমর্থন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা অষ্টাদশ লুইর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফরাসীবাসীরা অষ্টাদশ লুইর নতুন নামকরণ করল 'বরাহ লুই।' তারা অষ্টাদশ লুইর ওপর ক্রোধে ও ঘৃণায় ফেটে পড়িল। রাজ্য দুর্দশা ও অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অত্যাচারে ফরাসীবাসীরা মৃতপ্রায়। অপদার্থ অষ্টাদশ লুইর পক্ষে দেশের এ দুর্দশা মোচন করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

এদিকে নীচ প্রবৃত্তির লুই নেপোলিয়নের মাসিক ভাতা অনেক কমিয়ে দিলেন। নেপোলিয়নের অর্থকষ্ট চরমে উঠল। লুই কিন্তু নির্বাক। ফ্রান্সের এ অরাজকতার দিনে ফরাসীরা নেপোলিয়নের আশায় এলবার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলেন। কেউ কেউ নেপোলিয়নের পুনরায় ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের কথাও চিন্তা করতে লাগলেন।

অষ্টাদশ লুইর চেলাচামুণ্ডারা এ সমস্ত খবর অবগত হয়ে নেপোলিয়নের প্রাণসংহারের জন্য ও চিন্তা করলেন। ছক্ কেটে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন কিভাবে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। নেপোলিয়ন কিন্তু সব কথায় অনুধাবন করতে পারলেন।

চতুঃরাষ্ট্রশক্তি নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসনে পাঠাবার

কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। নেপোলিয়ন তখন ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপের একজন গৃহস্থ মাত্র। অর্থ বল, সৈন্যবল তাঁর নেই। সহায়হীন, সম্বলহীন নেপোলিয়ন তখন পড়াশুনা নিয়েই সময় কাটাতেন বেশী। তথাপি ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ নেপোলিয়নের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। ভয়ে কম্পমান। মানুষের দৈহিক বলই যে সব নয় এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নেপোলিয়ন এবার স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আবার নিজের দেশে ফিরে যাবেন। দেশের জনগণ ও তাঁর সেনানায়করা যে কি ভুল করেছে নেপোলিয়নের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তা তারা এখন বুঝতে পারছে। ফ্রান্স থেকে ছদ্মবেশে লোক এসে ফ্রান্সের জনগণ যে এখন নেপোলিয়নের জন্য আকুল সে কথা তাঁকে খুলে বললেন।

একদিন অর্ধেক ধরণীর অধীশ্বর আজ নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন অবস্থায় নিঃসঙ্গ দ্বীপে নির্বাসিত সম্রাটরূপে জীবন যাপন করছেন।

এদিকে ব্লইসের প্রাসাদে আর অধিকদিন মেরিয়া ল্যুইসার পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠল। খুবই স্বাভাবিক কারণে এবং অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রী ম্যাটারনিকের কূট কৌশলে তিনি নেপোলিয়নের সব চিন্তা ত্যাগ করে তাঁর বাপের বাড়ি পুত্রসহ পাড়ি দিলেন।

মেরিয়া ল্যুইসা ও যোসেফাইনের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে পার্থক্য ছিল অনেক। যোসেফাইনের চরিত্রে যে তেজ, প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ছিল তার কোনটাই ল্যুইসার মধ্যে ছিলনা বললেই চলে। তবে ল্যুইসার মধ্যে সরলতা ছিল। সম্রাট নেপোলিয়নের প্রতি কিঞ্চিৎ মমতাও যে ছিল না তা বলা যায় না। সে মমতা ও প্রীতি সম্রাট ল্যুইসার কাছ থেকে নিজের হৃদয়ের প্রসারতার জন্যই আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে যাবার চার সপ্তাহের মধ্যেই যোসেফাইন ইহলোক ত্যাগ করেন। শত চেষ্টা করেও যোসেফাইন এল্‌বা দ্বীপে

গিয়ে নেপোলিয়নের সাথে দেখা করতে পারেননি। চিরবিদায়ের আগে নেপোলিয়নের সাথে দেখা করতে না পেরে তিনি তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন। মৃত্যু এসে তাঁকে তাঁর সব চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করে দিল।

এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়ন ছিলেন মাত্র ১৩৬ দিন। মেরিয়া ওয়ালেস্কা দুঃখিত ও ব্যথিত হৃদয়ে তাঁর সাথে এল্‌বা দ্বীপে দেখা করতে যান। সঙ্গে ছিল তাঁদের ৪½ বৎসরের শিশুপুত্র আলেকজান্দ্রা এবং মেরিয়া ওয়ালাস্কার ভ্রাতা ও ভগ্নী। নেপোলিয়ন মেরিয়া ও তাঁর শিশুপুত্রকে দেখে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মেরিয়ার হাতে গভীর আবেগে নেপোলিয়ন স্নেহ চুম্বন দিলেন। পুত্র আলেকজান্দ্রাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে প্রাণভরে আদর করলেন। পুত্রের প্রতি (যদিও বা অবৈধ সন্তান) নিষ্কলুষ স্নেহের টানে তাঁর মন উচ্ছল হয়ে উঠল। কিন্তু নেপোলিয়ন ওয়ালাস্কাকে দু দিনের বেশী এল্‌বা দ্বীপে থাকার সুযোগ দিতে ভরসা পেলেন না। নেপোলিয়ন ভাবলেন এখবর যদি মেরিয়া ল্যুইসার কাছে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে মেরিয়া ল্যুইসা নেপোলিয়নের কাছে আর আসবেনই না।

দুইদিন শিশুপুত্র আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে বেশ আনন্দেই কাটালেন নেপোলিয়ন। এরকম সুন্দর প্রাণবন্ত শিশুর পিতা তিনি। প্রচণ্ড আবেগে একদিন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে বড় হয়ে কি হবে? অবোধ শিশু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সে বড় হয়ে নেপোলিয়নের মত একজন বীর সেনানায়ক হবে। নেপোলিয়ন তাকে জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন সম্পর্কে সে কি করে জানল। সে বলল যে সে নেপোলিয়নকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে কেন না তিনি হচ্ছেন তার বাবা। শিশুটি আরও বলে চলল যে তার মায়ের কাছ থেকেই সে এসব কথা জেনেছে। এবং তার মা তাকে আরও বলেছেন নেপোলিয়নের আদর্শ, বীরত্ব, কর্মক্ষমতা, উদ্দীপনা এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসকের গুণ যেন তার জীবনকে সুমহান করে তুলতে পারে।

সেভাবেই তাকে ছোটবেলা থেকে তার মা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করছেন। নেপোলিয়নের আদর্শ, বীরত্বপূর্ণ কাজকর্ম, তাঁর শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে তার মা তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গল্প বলতেন। ফলে নেপোলিয়ন সম্পর্কে তাঁর একটি সুমহান ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে ছোটবেলা থেকেই।

মেরিয়া নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা জানালেন —এটাও জানালেন যে ফ্রান্সের অধিবাসীরা এখনো নেপোলিয়নের জন্য উদ্‌গ্রীব। মেরিয়া নেপোলিয়নকে তাঁর সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে দিতে ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। ওয়ালাস্কাকে নেপোলিয়নের এরূপ অসহায় অবস্থা খুবই কাতর করে তুলেছিল। নারীর হৃদয়ের এগুলো সাময়িক অনুভূতি বলায় ভালো, কেন না মেরিয়া ওয়ালাস্কা এর পরে আবার বিয়ে করে তার দৈহিক ক্ষুধা মিটাবার জন্য নতুন স্বামী নিয়ে সুখে ঘর বেঁধেছিলেন। তখন নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। এই হচ্ছে নেপোলিয়নের নিয়তি।

নেপোলিয়নের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ওয়ালাস্কাকে বিদায় দিতে হবে। স্বভাবতই তিনি চিন্তায় কাতর। বিদায়ের ক্ষণে নেপো-লিয়ন নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। শুধু তাঁর হৃদয়ের সম্পদ পুত্র আলেকজান্ড্রার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন। নেপোলিয়ন নিজেই তাদের জাহাজে তুলে দিলেন। এল্‌বা দ্বীপে দাঁড়িয়ে ওয়ালাস্কা ও পুত্রের জাহাজের দিকে অতি করুণভাবে তাকিয়ে রইলেন। যতক্ষণ জাহাজ তাঁর চক্ষুর অন্তরালে না যাচ্ছে ততক্ষণই তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এল্‌বা দ্বীপে। বিদায় বেলায় পুত্রকে জানালেন "Good bye my child of my heart."

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। মেরিয়া ওয়ালাস্কার গর্ভে যেমন নেপোলিয়নের অবৈধপুত্র আলেকজান্ড্রার জন্ম হয়েছিল তদ্রূপ তাঁর রাজদরবারের রূপসী মহিলা মাদাম ডিন্যুয়েলের গর্ভে ও তাঁর আরও একটি পুত্র সন্তানের জন্ম

হয়েছিল। এই সন্তানকে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে রাস্তার ভিখারীর মতই তাঁকে দিন যাপন করতে হয়েছে। তখন অবশ্য নেপোলিয়ন পৃথিবীর অপর পারে চলে গেছেন।

১৮৮১ সালে নিয়তির নির্মম পরিহাসে নেপোলিয়নের এই অবৈধ সন্তান প্যারিসের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কি ফরাসী সরকার, কি ফরাসী জনগণ নেপোলিয়নের ঔরসজাত এই পুত্রের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি, ক্ষণিকের জন্য ও দুঃখ প্রকাশ করেনি।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নেপোলিয়ন এল্‌বা থেকে পলায়ন করে পুনরায় ফ্রান্সে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেনাপতি বারট্রাণ্ড ও সেনাপতি ড্রুয়েটকে সব কথা গোপনে জানালেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী অতিভোরে নেপোলিয়ন 'ইনকনষ্টান্ট' নামক ছোট জাহাজ ও তিনখানি সওদাগরী জাহাজে করে সহস্রাধিক কর্মচারী ও সৈনিকসহ ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করলেন। নেপোলিয়ন নিজের আত্মশক্তির ওপর ভর করে স্বরাজ্য আবার অধিকার করার মানসে কৃতনিশ্চয় হলেন। এটা যে কি দুরূহ কাজ সেটা তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না। কিন্তু তিনি এরকম বহুকাজ অতি সঙ্কটের মধ্যেও কঠোর পরিশ্রমে এবং রণ-কৌশলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাই এবারও সেরকম চিন্তায় তিনি করেছিলেন এবং তিনি এ অসাধ্য সাধনে সমর্থ হবেন এটা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ করলে ফরাসী জনগণ বিপুল উৎসাহে তাঁর দিকে ধাবিত হল। জানাল তাদের সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা। লুইর সৈন্যগণ প্রমাদ গুণলেন। লুই সিংহাসন ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। লুই সেনাপতি 'নে' কে নেপোলিয়নের গতিরোধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

নে নেপোলিয়নেরই বীর সেনাপতি ছিলেন। নে নেপোলিয়নকে

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে লুইর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। নেপোলিয়নকে দেখে এখন সে দুঃখিত, লজ্জিত। তাঁর কৃতকর্মের জন্ত তিনি অনুতপ্ত। সম্রাটকে বাধা দেওয়া ত দূরের কথা বরঞ্চ অবনত মস্তকে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নে তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন। নেপোলিয়ন নেকে বুকে জড়িয়ে ধরে—তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

নের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেপোলিয়ন করলেন না। শুধু পুরানো স্মৃতির রেশ ধরে দুজনের মধ্যে কিছু বাক্য বিনিময় হল।

ফরাসী প্রজাগণ, সৈন্যগণ সকলেই নেপোলিয়নকে তাদের আরাধ্য দেবতার ন্যায় সাদরে বরণ করে নিল। সম্রাটের অসাধারণ গুণ না থাকলে এভাবে সর্বস্তরের লোকের কাছ থেকে তিনি এত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও দেবতার ন্যায় পূজা পেতেন না। লা মার্টিন বলেছেন "নেপোলিয়ন ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।"

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান মনীষী, কবি, দার্শনিক ও প্রশাসক গেটে নেপোলিয়নকে 'সেন্ট জনের' সাথে তুলনা করে বলেছেন, "The story of Napoleon produces on me an impression like that produced the Revelation of saint John the Divine. We all feel there must be something more in it, but we do not know what."

নেপোলিয়ন পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। যোসেফাইনের মৃত্যুর কথা কাতর হৃদয়ে সকলের কাছে শুনলেন। যোসেফাইনের কথা উঠলেই সম্রাট যেন কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অপলক নয়নে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। ফরাসী জনগণ যোসেফাইনকে তাদের মায়ের আসনে স্থান দিয়েছিল। মাতৃহারা শিশুর ন্যায় তারা আজ অসহায় বোধ করছে সে কথা তারা নেপোলিয়নকে অকপটে জ্ঞাপন করল।

মেরিয়া ল্যুইসা কিন্তু তখন অষ্ট্রিয়াতে তাঁর শিশুপুত্র নিয়ে চলে

গেছেন। তাই নেপোলিয়ন ছেলেকে দেখতে চাইলেও তাঁর আর সে সুযোগ ছিল না। মেরিয়া ওয়ালাস্কাকে নেপোলিয়ন তাঁর শেষবারের মত ভালবাসা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু বেশীদিন মেরিয়া ওয়ালাস্কার সাথে তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রেম নিবেদন করার সুযোগ হলো না। ঘনিয়ে এলো ওয়াটারলুর যুদ্ধ। যেখানে ব্লুচার ও ওয়েলিংটন তাঁর মুখোমুখি হতে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন। মেরিয়ার সাথে শেষবারের মত একবার দেখা করার জন্য তাঁকে প্যারিস নিয়ে আসা হল। ওয়ালাস্কা ও পুত্র আলেকজান্দ্রার সাথে এ শেষ সাক্ষাৎকার নেপোলিয়নের।

নেপোলিয়নের এ দুঃসময়ে তাঁর জন্য অনুকম্পা বা দয়া দেখাবার জন্য তাঁর কোন প্রিয়তমা ছিলেন না। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যোসেফাইন নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হবার চার সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আর মেরিয়া ল্যুইসা তাঁর শিশু-পুত্রসহ অষ্ট্রীয়ায় বাপের বাড়ীতে পাড়ি দিয়েছেন। আর মেরিয়া ওয়ালাস্কার নেপোলিয়নের প্রতি স্নেহ ভালবাসা থাকলেও তাঁর দৈহিক ক্ষুধা তাঁকে অন্য লোকের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। তখন মেরিয়া ওয়ালাস্কার বৃদ্ধ স্বামী কাউন্ট কলোন্না ওয়ালেস্কি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন।

সব চেয়ে নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন মেরিয়া ল্যুইসা। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের নির্বাসিত জীবনের কথা জানতে পেরে ল্যুইসা খুশিই হয়েছিলেন। এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এ ভেবে যে নেপোলিয়নের কাছ থেকে তাঁর আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। তিনি তখন তাঁর দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে নানান যুবাপুরুষের সাথে গোপন প্রেম নিবেদন করে বেড়াচ্ছেন। হায় ছলনাময়ী নারীহৃদয়।

১৮১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর মেরিয়া ল্যুইসা একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিলেন যে, তিনি এবং তাঁর ছেলে

ফ্রান্সের কিছুই দাবী করবেন না। এমনকি তাঁর পুত্রও ফ্রান্সের সম্রাটের পদের জন্য কোনদিন দাবীদার হবে না। তারপর থেকে তিনি অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউচেস এবং পার্মার ডাচেস পদে ভূষিতা হলেন। ছেলে পরিচিত হল পার্মার রাজকুমার রূপে।

১৮১৮ সালের ২২শে জুলাই অষ্ট্রীয় সম্রাট ল্যুইসার পুত্রকে ডিউক অব রাইখষ্ট্যাডেট উপাধিতে ভূষিত করলেন। নেপোলিয়নের অন্তিম পরিণতিতে ল্যুইসা সুখীই হয়েছিলেন। **"Maria Louisa was, doubtless, glad to escape from the oppressive splendour of a brilliant career"—Abbott.** ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর যেন আর নেপোলিয়নের সাথে দেখা হবার সুযোগ না ঘটে।

ল্যুইসা অবশেষে অষ্ট্রীয়ায় এসে অ্যাডাম অ্যাব্রেষ্ট (দি কাউন্ট অব ভন্ নিপার্গ) নামক এক দুশ্চরিত্র লম্পটের সাথে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হন। অ্যাডাম অ্যাব্রেষ্ট ছিলেন একজন জার্মান সৈনিক। প্রকৃতপক্ষে অ্যাডাম ল্যুইসার রক্ষী ও গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন। অ্যাডামের ঔরসে মেরিয়ার গর্ভে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা কুৎসিৎরূপ পরিগ্রহ করেছিল যে—ল্যুইসার এ তিনজন ছেলের আসল পিতা কে সে নিয়েও অষ্ট্রীয়াতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এরা যে অ্যাডামের ঔরসজাত পুত্র সে ব্যাপারেও অষ্ট্রিয়াবাসীরা মোটেই নিঃসন্দেহ ছিল না। তাঁর প্রজারা পর্যন্ত ল্যুইসার সতীত্ব সম্পর্কে কটূ মন্তব্য করতে ছাড়ত না।

এভাবে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের দ্বিতীয়া পত্নী অত্যন্ত ঘৃণ্য চরিত্র ভ্রষ্টা নারীরূপে জার্মানী তথা সমগ্র বিশ্বের ঐতিহাসিকদের কাছে পরিচিতা হয়ে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। **"Abbott** বলেছেন, **'History has left no record of a female sovereign less beloved from the time of Theodesia."**

মেরিয়া ল্যুইসাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে

ইতিহাস কোন সঠিক মন্তব্য করেনি। বা কেউ সে সম্পর্কে জানেও না। বুরবোঁ বংশের রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হত। এবং বুরবোঁ বংশোদ্ভূত নারীরূপেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ল্যুইসা আজ মানুষের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন।

তবুও নেপোলিয়ন ল্যুইসাকে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করেছিলেন এবং নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর আচরণ ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতাকেও তিনি খুব দোষাবহ বলে মনে করেননি। তাই তিনি তাঁর শেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড যেন স্পিরিটে চুবিয়ে রেখে ল্যুইসার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

নেপোলিয়ন তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছে মেরিয়া ওয়ালাস্কার জন্যও প্রকাশ করতে পারতেন। মেরিয়া ওয়ালাস্কা কিন্তু মৃত্যুর আগে নেপোলিয়নের কথায় চিন্তা করে গেছেন। তিনি ল্যুইসার মত এত হৃদয়হীনা ছিলেন না। তখন ত যোসেফাইন নেই যাঁর কাছ থেকে নেপোলিয়ন পেয়েছিলেন নিষ্কলুষ ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতি।

তবুও বলা যেতে পারে যোসেফাইনের পরই যাঁর ভালবাসায় নেপোলিয়নের হৃদয় আপ্লুত হয়েছিল তিনি তাঁর অবৈধ পত্নী মেরিয়া ওয়ালাস্কা। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় নেপোলিয়ন খবর পেয়েছিলেন যে মেরিয়া ওয়ালাস্কার স্বামী মারা গেছেন। এবং মেরিয়া আবার বিয়ে করে সুখের ঘর বেঁধেছেন।

তাঁর নতুন স্বামী ছিলেন একজন ফরাসী উচ্চপদস্থ অফিসার। কর্সিকায় তাঁর জন্ম। নাম ডি. ওরনানো। নেপোলিয়নের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নেপোলিয়ন অবশ্য ওয়ালাস্কার নতুন বিয়েতে খুব আঘাত পেয়েছিলেন একথা বলা যায় না। কেন না নারী তাঁর একটি অবলম্বন চায়—তদুপরি এ অল্পবয়সে তাঁর মানসিক শান্তির জন্যও প্রয়োজন পুরুষের সঙ্গ। তবে নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন যে তাঁরও ওয়ালাস্কার পুত্র আলেকজান্ড্রা যেন ভবিষ্যতে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

অবশ্য মেরিয়া ওয়ালাস্কার পুত্র আলেকজান্দ্রা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রিয় পাত্র ছিলেন। এবং এই পুত্রকে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের একটি অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

মেরিয়া ওয়ালাস্কার নেপোলিয়নের প্রতি গভীর প্রেম থাকলেও তাঁর নতুন স্বামী ওরনানোকে ওয়ালাস্কা উষ্ণ প্রেমডোরে আবদ্ধ করেছিলেন। এবং ওরনানোর ঔরসে মেরিয়া ওয়ালাস্কার গর্ভে অল্পকাল পরেই একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু এর পর আর বেশিদিন মেরিয়া ওয়ালাস্কার পক্ষে পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ১৮১৭ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি পৃথিবীর সব মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে পরপারে চলে যান। যেখানে তিন বৎসর আগে নেপোলিয়নের প্রথমা স্ত্রী ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী যোসেফাইন চলে গেছেন।

হতভাগিনী যোসেফাইন মেলমাইসনের নির্জন প্রাসাদে মৃত্যুর পূর্বে "এল্‌বা দ্বীপ, নেপোলিয়ন এই ছুটি—বাক্য উচ্চারণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আর নেপোলিয়ন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন, "ফরাসীভূমি, সৈন্যমণ্ডলী ও যোসেফাইন।"

—•—

নেপোলিয়ন ও হরতেন্স বোহারনিজ

হরতেন্স বোহারনিজ ছিলেন যোসেফাইনের প্রথম পক্ষের মেয়ে। অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার বোহারনিজ ও যোসেফাইনের কন্যা।

বোহারনিজ পরিবার ছিল ফ্রান্সের অন্যতম সম্ভ্রান্ত পরিবার। ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে এই বোহারনিজ পরিবারের খ্যাতি ফ্রান্সের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বোহারনিজ পরিবারের ছেলে আলেকজাণ্ডারের সাথে যোসেফাইনের প্রথম বিয়ে হয়।

আলেকজাণ্ডার বোহারনিজের জন্ম ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের অন্তর্গত মার্টিনিক দ্বীপে। আলেকজাণ্ডার বোহারনিজ ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীতে এক উচ্চপদে কাজ করতেন। তিনি ফ্রান্সের হয়ে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি যোসেফাইনকে বিয়ে করেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি ন্যাশনাল এসেম্বলির প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাইনের সৈন্যবাহিনীর জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের যুদ্ধমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রোবসপীয়ারের সন্ত্রাসের রাজত্বে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তিনি নাকি ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ১৭৯৪ সালের ২৩শে জুলাই রোবসপীয়ারের নির্দেশে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গিলোটিনে তাঁকে প্রাণ দিতে হল।

পিতার মৃত্যুর সময় ইউজিন ও হরতেন্স দুজনই খুব ছোট ছিল। যোসেফাইন ও এ সময়ে এক ষড়যন্ত্রের ফলে বন্দিনী হন। ভাগ্যক্রমে

তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। অবশ্য তাঁকেও বেশ কিছুদিন কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

তিন বৎসর বয়সে যোসেফাইন হরতেন্সকে মার্টিনিক দ্বীপে স্বগ্রামে নিয়ে যান। এ বয়সে মার্টিনিক দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা তাঁর শিশু মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছোটবেলা থেকেই হরতেন্স ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু স্বভাবের মেয়ে। গরীবের দুঃখ দুর্দশায় তাঁর মন উঠতো কেঁদে।

আলেকজাণ্ডার ও যোসেফাইন যখন কারাগারে তখন ভ্রাতা ইউজিন ও ভগিনী হরতেন্স প্যারিসে তাদের এক বৃদ্ধা মাসীর কাছে থাকতেন। বৃদ্ধা মাসীর রোজগার ছিল খুবই অল্প। তাঁর রোজগারের টাকায় তিনজনের ভরণপোষণ চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে ইউজিন ও হরতেন্সকে এ শিশুবয়সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে অর্থ রোজগার করতে হতো। অল্পবয়স থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল দীন-দুঃখীর কি জ্বালা? ক্ষুধার্ত, অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত অবস্থায় থেকে ছোটবেলায় তারা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছে।

এ অবস্থায় তারা তাদের পিতার মৃত্যুর খবর অবগত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। মাকেও যে অচিরে হারাতে হবে সে কথাও তারা বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

ভাগ্যক্রমে যোসেফাইনের জীবন রক্ষা পেল। প্যারিসে ফিরে এসে বিধবা যোসেফাইন তাঁর দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করলেন।

যোসেফাইন একটু স্থির হয়ে বসে তাঁর দুটি শিশু সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা করেন। হরতেন্সকে মাদাম ক্যাম্পেন নাম্নী এক সর্বগুণান্বিতা ফরাসী মহিলার কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মাদাম ক্যাম্পেনের শিক্ষাগুণে হরতেন্সের সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার আচরণে হরতেন্স তাঁর সমবয়সী মেয়েদের আদর্শস্থানীয়া হয়ে উঠতে থাকে। তদুপরি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনও

সুন্দর ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

"Talents were the ornaments of the rich and the wealth of the poor" "প্রতিভা হচ্ছে ধনীদের অলঙ্কার আর দরিদ্রদের সম্পদ"-এ প্রবাদ বাক্যটি হরতেন্সের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

তাঁর মা যোসেফাইনের সাথে যখন নেপোলিয়নের বিয়ে হয় তখন হরতেন্স বিদ্যালয়ের ছাত্রী। নেপোলিয়ন ইতালী এবং মিশরের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে প্যারিসের তুইলারির প্রাসাদে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রথম কন্সাল নিযুক্ত হন। এ সময়ে হরতেন্সের সাহায্য ও সহযোগিতা নেপোলিয়নের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ছিল।

নেপোলিয়ন হরতেন্সকে নিজের কন্যার মতই ভালবাসতেন। ভ্রাতা লুইর সাথে হরতেন্সের বিয়ের সব ব্যবস্থা নেপোলিয়ন পাকা করে ফেলেছিলেন। তার জন্য তিনি যোসেফাইনের সম্মতি নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে এ বিয়েতে হরতেন্স সুখী হতে পারেন নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শেষ দিকে একরকম বিচ্ছেদই ঘটেছিল। নেপোলিয়ন ছোটভাই লুইকে ছোটবেলা থেকেই পিতার ন্যায় মানুষ করে তুলেছিলেন। তাই তিনি লুইর কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আশা করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর সে আশা ফলবতী হয়নি। লুইকে নেপোলিয়ন হল্যাণ্ডের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। লুই শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের কন্টিনেন্টেল সিস্টেম কার্যকরী করার ব্যাপারে লুই নেপোলিয়নের সাথে অসহ-যোগিতা করেন।

লুইর চরিত্র ছিল হরতেন্সের চরিত্রের ঠিক বিপরীত। হরতেন্সের মত দৃঢ়তা, মহত্ত্ব, উদারতা লুইর চরিত্রে মোটেই ছিল না। লুই ছিলেন শান্তির পূজারী। সম্রাট নেপোলিয়নের সাহসিকতা, ধৈর্য্য কোনটাই

তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়নি। তবুও দাদার কৃপাতে তিনি হল্যাণ্ডের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হরতেন্স স্বামীর কাছ থেকে রাজার বীরত্ব, শৈর্য্য ও দক্ষতা আশা করেছিলেন। এবং এ সমস্ত গুণাবলী যাতে তাঁর চরিত্রে প্রকটিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য হরতেন্স নিরলস প্রয়াস চালান। দুজনের মানসিক বৈপরিত্যের জন্য তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখকর হয়ে উঠতে পারেনি।

হরতেন্স মা হওয়ার পর থেকে কিছুটা মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন বিবাহিতা জীবনের মধুর সম্পর্ক। অবশ্য তাঁদের এ সম্পর্কেও অচিরে চিড় ধরেছিল। হরতেন্স তিনটি পুত্র সন্তানের জননী ছিলেন।

সুগায়িকা হিসেবে হরতেন্স প্যারিসে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেছিলেন। গ্রীক ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। গ্রীক্ ভাষায় তাঁর গান সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করত। অঙ্কন বিদ্যায়ও তাঁর অসাধারণ পারদর্শীতা ছিল। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন নাচে-গানে ও অংকন শিল্পে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রমণীদের মধ্যে অদ্বিতীয়া।

এ ছাড়া তাঁর সুমধুর ব্যবহার, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকলকে আকৃষ্ট করত। এই সমস্ত গুণের জন্য তিনি ইয়োরোপের সম্রাজ্ঞীকুলের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী হিসেবে সুপরিচিতা ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডাচেস্ ড্য আব্রেন্‌টিস (Duches d' Abrantes) হরতেন্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, "I have seen many, both in their own courts and in Paris but I never knew one who had any pretensions to equal talents" সত্যি তখনকার দিনে প্যারিসে হরতেন্সের ন্যায় এরকম একজন প্রতিভাময়ী নারী বিরল ছিল।

ভ্রাতা ইউজিন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রথম নেপোলিয়নের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদরের। নেপোলিয়ন তাঁকে কন্যার মতই স্নেহ করতেন। যদিও বা নেপোলিয়নের সাথে

তাঁর মা যোসেফাইনের বিয়েতে তিনি প্রথমে মত দিতে পারেন নি।

অনেকেই হয়ত যোসেফাইন কন্যা হরতেন্সের প্রতি নেপোলিয়নের এত গভীর ভালবাসাকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে—কিন্তু এ ভালবাসার মধ্যে বিন্দুমাত্র কলুষতা ছিল না। ছিল না কোন স্বার্থপরতা। এই ভালবাসা ছিল পিতা ও কন্যার ভালবাসা। যার মধ্যে ছিল গভীর পবিত্রতা।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে বিবাহিতা জীবনে হরতেন্স ছিলেন খুবই অসুখী। তার মূল কারণ ছিল তাঁর স্বামী লুইর মানসিকতা। নেপোলিয়ন তা ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন ভ্রাতা লুইকে হল্যাণ্ডের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করেন। হরতেন্সকেও স্বামীর সাথে হল্যাণ্ডে চলে যেতে হয়। মাকে ছেড়ে হল্যাণ্ডে যেতে হরতেন্সের হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে উঠেছিল।

লুই-এর সাথে হরতেন্স হল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছালে হল্যাণ্ডবাসীরা তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করে। হল্যাণ্ডবাসীরা সম্রাজ্ঞী হরতেন্স সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। লুই অবশ্য এর আগেও অনেকবার হল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের নির্দেশে বিভিন্ন কাজে গেছেন। তাই লুই সম্পর্কে হল্যাণ্ডবাসীদের মোটামুটি একটা ধারণা ছিল, যেটা তাদের হরতেন্স সম্পর্কে থাকার কথা নয়।

তাই হরতেন্স সম্রাজ্ঞী হিসেবে হল্যাণ্ডবাসীদের কতটুকু উপকারে আসবে সে ব্যাপারে তাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। হরতেন্স সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাদের প্রবল আগ্রহ ছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাজ্ঞী হরতেন্সের সুমধুর ব্যবহার হল্যাণ্ড-বাসীদের মুগ্ধ করেছিল। যোসেফাইনকে যেমন ফরাসীবাসীরা তাদের মায়ের আসনে স্থান দিয়েছিল—হল্যাণ্ডবাসীরাও হরতেন্সকেও প্রায় ততখানি সম্মান জানালো। এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আদায় করার জন্য হরতেন্সের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হল্যাণ্ড-

বাসীরা তাঁকে স্বর্গের দেবীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল।

হেগে অবস্থানকালে সম্রাজ্ঞী হরতেন্স তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, অতিথিদের আদর আপ্যায়ন, নাচ-গান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে হল্যাণ্ড-বাসীদের মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, তাঁর মার্জিত রুচি, তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা, সত্যি হল্যাণ্ডের যুবতীদের চরিত্রগঠনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তাঁর সামাজিক আচার-আচরণ, সব শ্রেণীর প্রজার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ও করুণা—হল্যাণ্ডের সর্বস্তরের লোকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও হরতেন্সের মন পড়েছিল তাঁর মা যোসেফাইন ও নেপোলিয়নের কাছে। প্যারিসে যাবার জন্য তাঁর মন সময় সময় এতই অস্থির হয়ে উঠতো যে তা তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন না। অন্তরে গভীর জ্বালা অনুভব করতেন। ১৮০৭ সাল। মে মাস। তখনো নেপোলিয়নের ঔরসে যোসেফাইনের গর্ভে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। ফ্রান্সের সম্রাট পদে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী কে হবেন সে নিয়ে ফ্রান্সের জনগণের চিন্তার কমতি ছিল না। এবং যোসেফাইনের যে মা হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই সেটা নেপোলিয়ন ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

নেপোলিয়ন সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তাই স্থির করে রেখেছিলেন যে তাঁরই বংশের ছেলে তাঁর ভ্রাতা লুই ও হরতেন্সের পুত্রকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ফ্রান্সের সম্রাটপদে মনোনীত করবেন। অতএব তাঁকে আর দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করতে হবে না, প্রয়োজন হবে না যোসেফাইনকে পরিত্যাগ করার।

তবে মানুষের ইচ্ছেতে ত সব চলে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মানুষের সব পরিকল্পনা এক মুহূর্তে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ৬ই মে ১৮০৭ সালে হরতেন্স ও লুইর প্রথম পুত্র মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সকলের আশাভরসার মূলে কুঠারা-

ঘাত করে পরম পিতা ঈশ্বরের ক্রোড়ে আশ্রয় নিল। হরতেন্সের পুত্রের এ মৃত্যু একদিকে যেমন হরতেন্স ও লুইকে শোকে মুহ্যমান করে দিল, অন্যদিকে নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের মনে কঠোর আঘাত হানলো।

যোসেফাইন একদিকে নীতির মৃত্যুশোকে কাতর অন্যদিকে ফরাসী সিংহাসনে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী কে হবেন সে চিন্তায় বিষন্ন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। যোসেফাইন এবার নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, নেপোলিয়নকে আবার দার পরিগ্রহ করতে হবে—ফরাসী জনগণের চাপে এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ফরাসী দেশের ভবিষ্যৎ সম্রাটের প্রয়োজনে। তাই একদিকে পুত্রের মৃত্যুতে যেমন হরতেন্স কাতর হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে যোসেফাইনকেও এ সংবাদ শোকে, দুঃখে ও হতাশায় কাতর করে তুলেছে।

নেপোলিয়ন এ সময়ে পোল্যাণ্ডের 'অস্তারডোর' নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে প্রবাসজীবন যাপন করছেন। নেপোলিয়নের কাছে এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছালে নেপোলিয়নের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। নেপোলিয়ন দু চোখ মুদ্রিত করে চুপচাপ বসে রইলেন। অবিরাম ধারায় তাঁর দুইটি গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। নেপোলিয়নের এ রকম মানসিক অবস্থা সন্দর্শনে কেউ তাঁর কাছে যাবার সাহস পাচ্ছিল না।

নেপোলিয়ন হরতেন্স পুত্র এ শিশুকে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্রাট অর্থাৎ তাঁর উত্তরাধিকারী করার কথা একরকম পাকাপাকি ভাবে স্থির করে রেখেছিলেন। হঠাৎ একদিন শরৎকালের অপরাহ্নে তাঁর মনের এই আশা মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নেপোলিয়ন শিশুর মত ক্রন্দন করে বলে উঠলেন তাঁর এত সব ঐশ্বর্য, এত সম্পদ কাকে তিনি দিয়ে যাবেন? কাকেই বা তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন?

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি

চাইতেন ফ্রান্সের সিংহাসনে বংশানুক্রমে তাঁরই বংশধরগণ রাজত্ব করে যাবেন। ফ্রান্সের স্বার্থে, ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে তাঁরই বংশধররা বংশ পরম্পরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হবেন। হরতেন্সের পুত্রের অকাল মৃত্যু তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিল।

যোসেফাইনের প্রতি নেপোলিয়নের হৃদয়ের অপার ভালবাসা ছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন যে হরতেন্স-তনয়ের অকাল মৃত্যুতে ফরাসী জনগণ ফ্রান্সের সিংহাসনে তাঁরই উত্তরাধিকারীকে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করার জন্য পুনরায় তাঁকে দার পরিগ্রহ করতে চাপ দেবে।

একদিকে যোসেফাইনের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম, অন্যদিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে তাঁরই বংশধরকে বসাবার সংকল্প, সে সঙ্গে বোনাপার্ট পরিবারকে ফ্রান্সে স্মরণীয় করে রাখবার গভীর আগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্নমুখী চিন্তার দ্বারা নেপোলিয়নের মনপ্রাণ ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। কয়েকদিন ধরে নেপোলিয়নের আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

অসাধারণ আত্মসংযম ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চাইলে কি হবে তাঁর চঞ্চল চক্ষু যুগল, পাণ্ডুর মলিন বদন, তাঁর অস্থির ভাব —তাঁর হৃদয়ের গভীর শোককে সর্বসমক্ষে তুলে ধরল।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মে তারিখে তিনি যোসেফাইনকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি দিলেন। চিঠিতে লিখলেন,

"প্রিয়তমা যোসেফাইন, হরতেন্স-পুত্র খোকা নেপোলিয়নের মৃত্যুতে তুমি যে কতখানি আঘাত পেয়েছ তা আমি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারছি। আমার শোকের ও উদ্বেগের পরিমাণও নিশ্চয় তুমি অনুভব করতে পারছ। কিন্তু এই দুঃখময় মনুষ্য জীবনে শোক তাপ সহ্য করা ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধান। আশা করি তোমার শারীরিক সুস্থতার সংবাদ শীঘ্রই পাব। আমার উদ্বেগ আর বর্ধিত করো না। এটা আমার একান্ত অনুরোধ। বিদায়। আমার ভালবাসা নিও।"

নেপোলিয়ন।

২০ শে মে, ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ন ফ্রিক্সেষ্টেইন থেকে হরতেন্সকে চিঠি দিলেন, "প্রিয়তমা কন্যা, হেগ থেকে যে সমস্ত খবর পাচ্ছি তাতে বুঝতে পারছি তুমি শোকে মুহ্যমান। তোমার শোকের কারণ খুবই গভীর তা জানি। তবুও বলি তোমার শোকের সীমা থাকা উচিত। তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করবে না। ধৈর্যশীল হও। শান্ত হতে চেষ্টা কর। মনে রাখবে মনুষ্যজীবন সব সময় নানান বিপদে সমাচ্ছন্ন রয়েছে। জীবনে দুঃখ বিপদ এত অধিক যে-মৃত্যুকে অধিক অমঙ্গলদায়ক মনে করা যায় না।"—নেপোলিয়ন

হরতেন্সের প্রথম পুত্র মারা যাবার পর যোসেফাইন হরতেন্সকে প্যারিসে নিয়ে আসেন। হরতেন্স বেশ কিছুদিন মায়ের সাথে কাটালেন। এ সময় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসেই হরতেন্সের পুত্র লুই নেপোলিয়নের জন্ম হয়। লুই নেপোলিয়ন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইতিহাসে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে পরিচিত।

তৃতীয় নেপোলিয়ন শৈশব থেকে নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ হন। কেন না তাঁর পিতা লুইর সাথে মা হরতেন্সের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। দ্বিতীয়ত তাঁর সাত বৎসর বয়সে প্রথম নেপোলিয়ন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য সেণ্টহেলেনায় বন্দী অবস্থায় চলে যেতে বাধ্য হন। আর তাঁর দিদিমা যোসেফাইন ত তখন পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে গেছেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নেপোলিয়ন ও ল্যুইসার একমাত্র বৈধপুত্র (যাঁকে রোমের নরপতি নামে অভিহিত করা হতো) অষ্ট্রীয়াতে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মা মেরিয়া ল্যুইসা তখন অষ্ট্রীয়াতে নতুন স্বামীর ঘর করছেন। প্রথম নেপোলিয়ন ও ল্যুইসার পুত্রের মৃত্যুর পর থেকে লুই নেপোলিয়ন ফরাসী সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান।

প্রথম নেপোলিয়নের পুত্রের মৃত্যুর সময় লুই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডে

ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর লুই নেপোলিয়ন বুঝতে পেরেছিলেন ফ্রান্সের লোকেরা প্রথম নেপোলিয়নের কোন বংশধরকে তাদের সম্রাটপদে বসাতে চান। ফ্রান্সের জন্য প্রথম নেপোলিয়নের অনবদ্য অবদান ও আত্মত্যাগের কাহিনী তখনো ফরাসীবাসীদের মুখে মুখে বহুল প্রচারিত। লুই নেপোলিয়ন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

এই সুযোগে তিনি ফরাসী সিংহাসন অধিকার করার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু এ বিদ্রোহে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে তাঁকে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার ফরাসী সিংহাসন দখল করার জন্য চেষ্টা করেন। এবারও তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বন্দী হয়ে বেশ কিছুদিন কারাগারে কাটান। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ইংলণ্ডে চলে যান।

ইংলণ্ডের চার্টিষ্ট আন্দোলনের সময় তিনি সেখানে পুলিশ কনষ্ট-বলের কাজ নেন।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে তিনি আবার প্যারিসে এসে উপস্থিত হন। এবং জনগণের ভোটে তিনি ফ্রান্সের ন্যাশানেল এসেম্বলির সভ্য হন। তিন মাস পর তিনি ফ্রান্সের দ্বিতীয় রিপাব্লিকের সভাপতি নিযুক্ত হন। এর চারবৎসর পর তিনি ফ্রান্সের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রথম নেপোলিয়নের নামের মোহেই লোকে তাঁকে ফরাসী সম্রাটপদে বরণ করে নিয়েছিল। প্রথম নেপোলিয়নের প্রতিভা তাঁর মধ্যে মোটেই ছিল না। তবুও নেপোলিয়নের নামের জোরে তিনি ফরাসী সিংহাসনে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতা লুই ও নেপোলিয়নের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে ঘোর মতবিরোধ ঘটে। নেপোলিয়ন সে সময় হল্যাণ্ডকে

হল্যাণ্ডে লুইর কাছে প্রেরণ করেন। হরতেন্সকে নেপোলিয়ন নির্দেশ দেন যেন তিনি লুইকে সমস্ত ব্যাপার পরিজ্ঞাত করে নেপোলিয়নের নির্দেশ মত চলতে রাজী করান।

নেপোলিয়নের নির্দেশে হরতেন্স হল্যাণ্ডে গিয়ে লুইকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। লুই কিন্তু হরতেন্সের কথার কোন আমলই দিলেন না। বরঞ্চ নিজেকে হল্যাণ্ডের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং নেপোলিয়নের 'কন্টিনেন্টেল' সিস্টেম কার্যকরী করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন।

নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে লুইর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। লুই এ সংবাদ অবগত হয়ে হল্যাণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান। হরতেন্স পুত্রদের নিয়ে প্যারিসে চলে যান। প্যারিসে এক বিশাল প্রাসাদে তিনি পুত্রদের নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তখনো ফ্রান্সের জনগণ তাঁকে হল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞী বলেই জানতেন।

মাতা যোসেফাইনের সাথে নেপোলিয়নের বিচ্ছেদের সময় হরতেন্স প্যারিসেই ছিলেন। নেপোলিয়ন হরতেন্সকেই যোসেফাইনের সাথে তাঁর বিচ্ছেদের কারণগুলি বুঝিয়ে বলার জন্য বলেন। কিন্তু মা যোসেফাইনের প্রতি হরতেন্সের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করল।

যোসেফাইনই ছিলেন তাঁর পুত্র কন্যা ও নেপোলিয়নের মধ্যে বন্ধনের মূল সূত্র। যোসেফাইনের সাথে নেপোলিয়নের বিচ্ছেদের ফলে ইউজিন ও হরতেন্সের সাথেও নেপোলিয়নের সম্পর্কের চিড় ধরল। অবশ্য যোসেফাইন তাঁর পুত্রকন্যাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন সম্রাটের জন্যই তাঁদের আজ এত শ্রীবৃদ্ধি। অতএব হরতেন্স ও ইউজিন যেন সম্রাটকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। সম্রাটের মনে আঘাত লাগতে পারে এরকম যে কোন কাজ থেকে যেন তাঁরা বিরত থাকেন। এখানেই যোসেফাইনের চারিত্রিক মহত্ত্ব।

অবশ্য ইউজিন ও হরতেন্স নেপোলিয়নকে শেষ পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছেন। মেরিয়া ল্যুইসার সাথে সম্রাট নেপোলিয়নের বিয়েতেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত সমর্থন জানিয়েছিলেন।

মেরিয়া ল্যুইসার শকট বয়ে নিয়ে যে চারজন বিভিন্ন দেশের সম্রাজ্ঞী তাঁকে নেপোলিয়নের সাথে বিয়ের আসরে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে হরতেন্স ছিলেন অন্যতমা। হরতেন্স এই শকট বয়ে নিয়ে যাবার সময় অঝোরে কেঁদেছেন এবং নেপোলিয়ন ও মেরিয়া ল্যুইসার বিয়ের শেষ মন্ত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হরতেন্স শোকে জ্ঞান হারিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়েন। তবে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর মনকে শক্ত করে ফেলেছিলেন। পুনরায় জ্ঞান ফিরে এলে তিনি নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করলেন।

লুই দাদা নেপোলিয়নের সাথে যোসেফাইনের বিবাহ বিচ্ছেদকে সমর্থন জানাতে পারেননি। লুই যোসেফাইনকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তবে লুইও দাদার আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরই দোষে হরতেন্সের সাথে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। হরতেন্স চলে আসেন প্যারিসে।

আর লুই সিংহাসনচ্যুত হয়ে হল্যাণ্ড থেকে মাতা লেটিজিয়ার সাথে বসবাসের জন্য রোমে চলে যান। এর পর থেকে হরতেন্সের সাথে লুইর আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। ইচ্ছে থাকলেও হরতেন্স স্বামী লুই-র সাথে পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। কেন না নেপোলিয়নের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর যোসেফাইনকে ম্যালমাইসনের নির্জন প্রাসাদে একাকী থাকতে হতো। সে সময় হরতেন্স মা যোসেফাইনের কাছেই থাকতেন। বিশেষত নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে চলে যাবার পর যোসেফাইন যখন নেপোলিয়নের অসহায় অবস্থায় খবর অবগত হয়ে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন—তখন তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য হরতেন্সের ম্যালমাইসন প্রাসাদে অবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

সে সময় রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার এবং বিদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ম্যালমাইসনের প্রাসাদে যোসেফাইনকে দেখতে আসতেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার খবরাখবর রাখতেন। নেপোলিয়ন তখন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। এ সময় হরতেন্সের সাথে বিদেশের এ সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকজনদের পরিচিতি ঘটার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। নেপোলিয়নের জন্য অন্তরের গভীর আকর্ষণে যোসেফাইন যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত সে সময় হরতেন্স ও ইউজিন মায়ের শয্যাপাশে দিনের পর দিন বিনিদ্র নিশিযাপন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর হরতেন্স বুরবোঁ সম্রাট অষ্টাদশ লুই সমীপে গিয়েছিলেন। তাঁর মা যোসেফাইনের প্রতি অষ্টাদশ লুই মৃত্যুর পূর্বে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেই মূলত হরতেন্স অষ্টাদশ লুইর কাছে গিয়েছিলেন। তবে এতে নেপোলিয়নের বন্ধু-বান্ধবরা হরতেন্সের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এ সময় লুই প্যারিসের কোর্টে তাঁর দুই পুত্রকে দাবী করে হরতেন্সের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। অবশ্য এই মামলার নিস্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা এমন সময় নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ থেকে পলায়ন করে প্যারিসে এসে উপস্থিত হন। ফ্রান্সে তখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়নের আগমনের সংবাদে সিংহাসন পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। নেপোলিয়নের আগমনে ফ্রান্সে বয়ে চলেছে উৎসবের বন্যা।

ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ন প্যারিসে পালিয়ে এসে ম্যালমাইসনে অবস্থান করেন কিছুদিন। যেখানে তাঁর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী যোসেফাইন কিছুকাল আগে দেহত্যাগ করেছেন। ম্যালমাইসনের প্রতিটি ইট, কাঠ পাথরে নেপোলিয়নের কত সুখ-স্মৃতি বিজড়িত। নেপোলিয়নের এ দুঃসময়ে যোসেফাইন কন্যা হরতেন্সই তাঁকে দেখাশুনা করতেন ম্যালমাইসনের প্রাসাদে।

অবশ্য নেপোলিয়নের পক্ষে বেশিদিন ম্যালমাইসনের প্রাসাদে

অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার অধিকাংশ সদস্য নেপোলিয়নকে ফ্রান্স ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করলেন। তাঁরা নেপোলিয়নকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে থাকলে মিত্র শক্তি সসৈন্যে ফ্রান্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ফ্রান্সে প্রবাহিত হবে রক্তগঙ্গা। অতএব দেশের স্বার্থে ছলে, বলে, কৌশলে তাঁরা নেপোলিয়নকে শত্রুহস্তে তুলে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করবেন না।

ফ্রান্সের সাধারণ লোক কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষেই ছিল, সৈন্যবাহিনীও তাঁর জন্য প্রয়োজন বোধে আবার বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু নেপোলিয়ন নানান্ চিন্তাভাবনা করে মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। নেপোলিয়নের ফ্রান্স পরিত্যাগের পর হরতেন্স সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানে তিনি কনসটান্স (Constance) শহরে বসবাস করতে থাকেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্নেম্বার্গ (Arnemberg) নামক স্থানে একটি বিরাট সম্পত্তি ক্রয় করেন। গ্রীষ্মকালে হরতেন্স সেখানেই বাস করতেন। আর শীতকালে তিনি চলে যেতেন রোমে। সেখানে ছিলেন তাঁর ননদ পলিন এবং নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়া। হরতেন্স গোটা শীতকালটা কাটাতেন ননদ পলিনের সাথে।

দুই জীবিত পুত্রের মধ্যে বড় পুত্র জেঠামশাই যোশেফের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোপের রাজ্য রোমে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁর দুই পুত্রই তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে সে বিদ্রোহে যোগদান করেন। বড় পুত্র সেখানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পাতিত হন। হরতেন্স কোনক্রমে ছোট ছেলেকে নিয়ে আর্নেম্বার্গে চলে আসেন। হরতেন্স তাঁর আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ নেপোলিয়নের মৃত্যুর প্রায় ১৬ বৎসর পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লুই নেপোলিয়ন তখন আমেরিকায় ছিলেন। মায়ের অসুস্থতার

খবর পেয়ে তিনি আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসেন। মৃত্যুর পর হরতেন্সের দেহাবশেষ প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে **Ruel church** এ মা যোসেফাইনের সমাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হরতেন্স স্মৃতিপট থেকে তাঁর বিচিত্র জীবনের কাহিনী লিখে গেছেন। হরতেন্স যখন সুজারল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন সে সময় তাঁর গৃহে বহু সুধীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি শিল্পবিত্তায় অসাধারণ পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অঙ্কন শিল্পে দক্ষতা তিনি তাঁর বিভিন্ন অঙ্কনের মধ্যে প্রতিফলিত করে গেছেন। তবে নেপোলিয়নের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি তাঁর জীবনের এ সমস্ত কাহিনী অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন। J. S. C. Abbott বলেছেন, "She spoke freely of brilliant days of her prosperity, and history that flowed naturally from her lips for the education of her listeners."

শৃঙ্খলিত নেপোলিয়ন

বেলেরোফোন ও নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজে বন্দী নেপোলিয়ন

ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় তাঁর বীরের জীবনের অবসান ঘটল। শুরু হল তাঁর বন্দীজীবন। ওয়াটারলু বেলজিয়ামের একটি গ্রামের নাম। ব্রুসেল্‌সের দক্ষিণে অবস্থিত। ব্রুসেলস থেকে ওয়াটারলুর দূরত্ব এগার মাইল।

নেপোলিয়ন যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর জয়ের আশা নেই তখন তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত সৈন্য ও সেনাপতি নিয়ে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সম্মুখ সমরেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিতে। এর জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ হল না। রক্ষী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি কাম্ব্রোনী এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঘোড়ার বল্গা ধরলেন টেনে।

নেপোলিয়নকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁর শত্রুরা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেবার সুযোগ দেবে না। তারা তাঁকে বন্দী করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। এবং লোকচক্ষে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে। সম্রাট প্রথমে সেনাপতির কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। কিন্তু তাঁর মনে হঠাৎ গভীর ভাবের উদয় হল। তিনি বুঝতে পারলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপভাবে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। অশ্রুসজল নয়নে তিনি সেনাপতির কথা মেনে নিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিকগণ তাঁর নামে জয়ধ্বনি করে উঠলো।

নেপোলিয়নের জীবনী লেখক এবট লিখেছেন "Cambronne, its brave commander seized the reins of the Emperor's

horse and said to him, in beseeching tones "Sire, death shuns you. You will but be made a prisoner."

page-528

কাম্ব্রোনী নেপোলিয়নকে সরিয়ে দিয়ে বীর বিক্রমে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি গুরুতররূপে আহত হলেন। তাঁর দেহের ছয়টি স্থানে আঘাত লাগল। সমস্ত দেহখানি হল রক্তাপ্লুত। শত্রু সৈন্যরা তাঁকে জানাল তিনি আত্মসমর্পণ করলে তারা তাঁর প্রাণ দান করবে। কিন্তু কাম্ব্রোনী ও তাঁর বীর সৈন্যরা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলো।

এরপর নেপোলিয়নের জন্য সেণ্টহেলেনার পথ ছাড়া ভিন্ন কোন পথ উন্মুক্ত রইল না। ইয়োরোপখণ্ডে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতার আশা তিরোহিত হল। ইয়োরোপে রাশিয়া, প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের যথেচ্ছাচার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ওয়াটারলুর মহা-সমরের ঘটল অবসান।

২১ শে জুন ১৮১৫। শেষ রাত্রে নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন। সুবৃহৎ প্যারিস নগরী তখন ঘুমে অচৈতন্য। কেবলমাত্র নেপোলিয়ন ও তাঁর মুষ্টিমেয় একান্ত অনুগামী সৈন্য ও সেনাপতির চোখে ঘুম নেই। ক্লান্ত ও অবসন্ন সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে নেপোলিয়ন তুইলারির প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের একটি কক্ষে সম্রাট একাকী প্রবেশ করলেন। নির্জন কক্ষে সম্রাট চিন্তায় মগ্ন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম সমাপনান্তে তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করলেন। স্নান শেষ করে তিনি তাঁর অনুগত কলিন কোর্টকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন তিনি তাঁর উভয় মন্ত্রণাসভার একসঙ্গে অধিবেশন ডাকতে চান। এবং সেখানে তিনি তাঁর সৈন্যগণের দুর্দশার কথা সবিস্তারে বলতে চান। তিনি আরও বললেন তিনি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কথা চিন্তা করছেন।

তখন প্যারিসের অবস্থা শোচনীয়। চারিদিকে চলছে ঘোর

অরাজকতা। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদে ফ্রান্সের সর্বত্রই বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। নেপোলিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে একযোগে দণ্ডায়মান হল। তাঁর শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর কাছে যারা চিরকাল উপকার পেয়ে এসেছে তারাও তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হল।

তারা নেপোলিয়নকে স্মরণ করিয়ে দিল যে তিনি যদি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চান তাহলে ইয়োরোপের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্যারিসের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্যারিস নগরীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে তারা নেপোলিয়নকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে তুলে দিতে কৃতসংকল্প। নেপোলিয়ন ফ্রান্স থেকে বিদূরিত না হলে ফ্রান্স শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না—এটা তাদের স্থির বিশ্বাস।

ফ্রান্সের বেশির ভাগ লোক তখনো কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে। নেপোলিয়ন ইচ্ছে করলে এক ডাকে কয়েক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে পারেন। এলিসের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ ফরাসী সম্রাটের প্রজা সমবেত হয়ে সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। নেপোলিয়নের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার সংকল্পের কথাও তারা তাঁকে জানাল। শুধু সম্রাটের নির্দেশের অপেক্ষায় তারা আছে।

নেপোলিয়ন এ সমস্ত প্রজাদের সম্পর্কে তাঁর সেনাপতিদের বললেন যে এ সমস্ত প্রজাসাধারণকে তিনি সিংহাসনে আরোহণের সময় যে দারিদ্র্যের মধ্যে দেখেছিলেন এখনো তারা ঠিক সেই অবস্থায় আছে। তাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ তাদের কি অসাধারণ দেশপ্রেম। সম্রাটের প্রতি তাদের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। নেপোলিয়ন ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে প্রতিনিধি সভা ভেঙ্গে দিতে পারতেন। এদের অস্তিত্ব করতে পারতেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কিন্তু তা তিনি করতে চাননি। ফ্রান্স গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হোক সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বললেন, "আমার জন্য আর

একটি জীবনও বিনষ্ট হবে না, প্যারিস নগরে রক্তস্রোত প্রবাহিত করার জন্য আমি এলবা ত্যাগ করে আসিনি।"

প্রতিনিধি সভার উভয় কক্ষের বেশির ভাগ সদস্যই নেপোলিয়নকে সিংহাসন পরিত্যাগ করার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশ্য তাঁর একান্ত অনুগত যাঁরা ছিলেন তাঁরা নেপোলিয়নকে আশা দিয়ে যেতে লাগলেন। তথাপি প্রতিনিধি সভার বেশির ভাগ সদস্যের বারংবার অনুরোধে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগের সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। নেপোলিয়ন ছোট ভাই লুসিয়েনকে ডাকলেন। তাঁকে কাগজ কলম নিয়ে নেপেলিয়নের বক্তব্য লিখে যেতে বললেন। নেপোলিয়ন বলে গেলেন লুসিয়েন তাঁর বক্তব্য অবিকল লিপিবদ্ধ করে গেলেন। নেপোলিয়ন বললেন,

"হে আমার প্রিয় ফরাসীজনগণ, আমি আমার স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা রক্ষার্থে কৃতনিশ্চয় হয়ে বিদেশী শত্রুর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আমি আমার দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে আমার সংকল্পে অটল ছিলাম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আমি তাঁদের বিরুদ্ধে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। দৈবক্রমে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। আমি ফ্রান্সের শত্রুহস্তে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলাম। আমার প্রার্থনা তাঁরা আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই যেন ক্ষান্ত থাকেন। আমার দেশবাসীর ক্ষতি সাধনে তাঁরা যেন ব্রতী না হন।"

নেপোলিয়ন আরও বলে গেলেন যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটল। এবং তিনি তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে ফরাসী সম্রাট মনোনীত করে গেলেন। বর্তমান মন্ত্রিসভা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের নামে রাজ্যশাসন করবে। ফরাসী-জনগণ জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে কাজ করে যাক, দেশে শান্তি স্থাপিত হোক, দেশের স্বাধীনতা থাকুক অক্ষুণ্ণ—এটাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা।

"My political life is ended. and I proclaim my son, under the title of Napoleon II, Emperor of the French. The present ministers will provisionally form the council of Goverment. The interest I feel in my son prompts me to request to the chambers to organise, without delay, the regency by a law. Let all unite for the public safety, and to remain an independent nation"—Napoleon. At the Palace of the Elysee, June, 22, 1815.

নেপোলিয়নের একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি (বয়সে প্রায় বৃদ্ধ) কার্ণট নেপোলিয়নের ফ্রান্স ত্যাগের সংকল্পের কথা অবগত হয়ে কেঁদেই ফেললেন। ফ্রান্সে আরম্ভ হল ঘোর অরাজকতা। কেউ কারো কথাই কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করল না, স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তারা প্রত্যেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠল।

নেপোলিয়নের সেনাপতিও একান্ত হিতৈষী বন্ধু মনথোলন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি নেপোলিয়নকে দোষারোপ করে বলেই ফেললেন—দেশের সাধারণ লোক যখন তাঁর পেছনে রয়েছে, ফরাসী সৈন্যদের অধিকাংশই যখন তাঁর একান্ত অনুগত, অনেক সেনানায়কও যখন তার মতাবলম্বী— সে অবস্থায় স্বদেশের কথা চিন্তা করে তাঁর উচিত ছিল নতুনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করে বীর বিক্রমে শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করা। কিন্তু তা না করে তিনি শত্রু হস্তে নিজে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। প্রতিনিধি সভার অধিকাংশ লোকের মতে সায় দিয়ে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এটা মনথোলন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

নেপোলিয়ন মনথোলনকে বুঝিয়ে বললেন তাঁর জন্য ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হোক সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করে ফ্রান্স থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তদুপরি প্রতিনিধি সভা ও তাঁর বেশীরভাগ বিশ্বস্ত সেনাপতি যখন তাঁকে আর পছন্দ করছেন না—তাঁকেই দেশের শত্রু মনে করছেন —তখন স্বদেশের স্বার্থে তাঁর দেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন পথ নেই। তাই তিনি তাঁর ফ্রান্সত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল।

কিন্তু যখন তিনি শুনতে পেলেন মাতৃভূমি ফ্রান্সের দিকে শত্রুসৈন্যরা তীব্র বেগে ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ছুটে-আসছে তখন তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি প্রতিনিধিসভার অনুমতি নিয়ে সৈন্য বাহিনীকে সুসজ্জিত করার চেষ্টা করলেন। প্রতিনিধি-সভার অধিকাংশ সদস্য এতে সম্মতি দিলেন না। প্রনিনিধিসভার সদস্য বিশ্বাসঘাতক ফোচে ভেতরে ভেতরে ডিউক অব ওয়েলিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফৎ যোগাযোগ রেখে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফোচের চক্রান্তে ফ্রান্সে গঠিত হল একটি পুতুল সরকার। ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনরায় উপবিষ্ট হলেন ফরাসী সম্রাট অষ্টাদশ লুই। কোনক্রমে ফ্রান্স থেকে নেপোলিয়নকে বিতাড়িত করতে পারলে ফোচের কার্যসিদ্ধি হবে এটা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

নেপোলিয়নকে সম্রাটের পদ থেকে অপসারণের ফলে ফ্রান্সে দেখা দিল প্রচণ্ড রকমের বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা বুরবোঁ সম্রাটের ছিল না। ফোচের পক্ষেও এ পরিস্থিতির সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। ফোচের বুঝতে অসুবিধে হল না যে ফ্রান্সের অগণিত সৈন্য সামন্ত সাধারণ লোক এখনো সম্রাটের নামে জয়ধ্বনিতে মুখরিত। তাই ফোচে ভীত সন্ত্রস্ত। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁর প্রাণওষ্ঠাগত। শুধু ভাবতে লাগলেন কতক্ষণে নেপোলিয়ন ফ্রান্স থেকে বিদায় নেবেন।

নেপোলিয়ন এবার এলিস প্রাসাদ ছেড়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। যাবার আগে কলিনকোর্টকে বলে গেলেন যেন ফ্রান্সের

স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি যথাযথভাবে সব কিছু করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

এটাও নেপোলিয়ন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চয় জেনারেল কার্ণটের প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পাবেন। সেনাপতি ও তাঁর মরমী সাথী কলিনকোর্টকে সান্ত্বনা দিয়ে নেপোলিয়ন কিছুদিন ম্যালমাইসনে অবস্থানের জন্য গমন করলেন।

সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন যোসেফাইন ও আলেকজাণ্ডার বোহারনিজের কন্যা হরতেন্স। হরেতেন্স নেপোলিয়নের এ করুণ অবস্থা দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। তিনি কেঁদে আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে নেপোলিয়ন আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছেন।

ম্যালমাইসনের প্রাসাদে নেপোলিয়ন কয়েকদিন কাটালেন। কত সুখস্মৃতিই না তাঁর মনে পড়তে লাগল। এই ম্যালমাইসনের প্রাসাদে তাঁর প্রিয়তমা মহীয়সী সম্রাজ্ঞী যোসেফাইন থাকতেন এবং এই প্রাসাদেই তিনি তাঁর কথা চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে যোসেফাইন জীবনের সব মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে যান।

এই ম্যালমাইসনে সম্রাট যোসেফাইনের জন্য একটি সুন্দর উদ্যান তৈরি করে দিয়েছিলেন। ম্যালমাইসনের প্রতিটি ইট, কাঠ, পাথর নেপোলিয়নের আদরের সামগ্রী। তাতে রয়েছে তাঁর কত সুখস্মৃতি বিজড়িত। ভাবতে ভাবতে নেপোলিয়ন জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। প্রিয়তমা যোসেফাইনের সাথে তিনি কত মধুযামিনী এই প্রাসাদে যাপন করেছেন। সবই আজ সম্রাটের মনে পড়তে লাগল। আর তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

যোসেফাইন কন্যা হরতেন্স ও সমভাবে বেদনায় কাতর। প্রায় সপ্তাহ খানেক ম্যালমাইসনে অবস্থান করার পর নেপোলিয়ন আর

সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

নেপোলিয়ন স্থির করলেন তিনি আমেরিকায় পাড়ি দেবেন। এবং সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকায় নির্বাসিত জীবনযাপন করবেন। প্যারিস প্রবাসী কয়েকজন আমেরিকান ভদ্রলোকের কাছ থেকে তিনি এ আশ্বাস পেয়েছিলেন যে তিনি আমেরিকায় গিয়ে সুখে বসবাস করতে পারবেন। আমেরিকাবাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে।

প্রতিনিধিসভা ভাবতে লাগলেন যত শীঘ্রই নেপোলিয়ন প্যারিস থেকে বিদায় নেন ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল। নেপোলিয়ন ত ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নেপোলিয়ন প্রতিনিধিসভাকে জানিয়ে দিলেন তাঁর দুখানা জাহাজ দরকার যাতে করে তিনি আমেরিকায় পাড়ি দিতে পারেন তাঁর একান্ত অনুগত সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে।

প্রতিনিধিসভা তাঁর জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু বিপদ হলো জাহাজযোগে যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আর ডিউক অব ওয়েলিংটনের সম্মতির প্রয়োজন।

সম্মতি দরকার ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও। এদিকে নেপোলিয়ন যাতে ম্যালমাইসন থেকে ইংলিশ সৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে সমুদ্রবক্ষে কোথাও পালিয়ে যেতে না পারেন তারজন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে প্রচুর রণতরী পাহারার জন্য নিয়ে আসা হল। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন তাঁর পক্ষে ব্রিটিশ রণতরীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

নেপোলিয়নের নির্দ্দেশ ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব ডিউকঅব ওয়েলিংটনের কাছে নেপোলিয়নের আমেরিকা যাবার অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি নিয়ে দেখা করলেন। এদিকে প্রতিনিধিসভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নেপোলিয়ন যাতে মত পরিবর্তন করে আবার ফরাসী

জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে সম্রাজ্যের বিপদ সাধনে ব্রতী হতে না পারেন সেজন্য সেনাপতি বেকারকে নেপোলিয়নের কাছে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ম্যালমাইসনে প্রেরণ করলেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নেপোলিয়ন রাজ্যের পরিচালকবর্গের মনোভাব পরিজ্ঞাত হলেন। বেকার ও নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভার মনোভাব জানালেন। নেপোলিয়নের বন্ধুরাও সম্রাটের প্রাণ নাশের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। যোসেফাইন কন্যা হরতেন্স শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢা হয়ে পড়লেন। এবট তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,

"She (Hortense) restrained her own tears" says Baron Fleury "reminding us with the wisdom of a philosopher and the sweetness of an angel, that we ought to surmount our sorrows and regrets, and submit with docility to the decrees of Providence."

নেপোলিয়ন ফ্রান্স ত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি ফরাসী গভর্ণমেন্টকে পত্র দিলেন। ফরাসী গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হল যে, তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত, তবে ডিউক অব ওয়েলিংটন কিম্বা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছ থেকে তখনো পর্যন্ত কোন অনুমতি পত্র পাওয়া যায় নি।

বরঞ্চ ডিউক অব ওয়েলিংটনের পরামর্শে ব্রিটিশসরকার ফরাসী সমুদ্রে ব্রিটিশ রণতরীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করলেন। যাতে নেপোলিয়ন কোন ক্রমেই পালিয়ে যাবার সুযোগ না পান। অন্য উপায় না দেখে ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভা তাঁকে ছদ্মবেশে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। ফোচে ইতিমধ্যে ভুয়ো পাশপোর্ট করে বেকারের সাহায্যে নেপোলিয়নকে আমেরিকা পাঠাবার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। নেপোলিয়ন কিন্তু ফোচের এ পরিকল্পনায় সম্মতি দিতে পারেন নি। ফোচের ইচ্ছে ছিল নেপোলিয়নকে কোনক্রমে বন্দী করে

রাখা। সেভাবে ফোচে পরিকল্পনাও করে রেখেছিলেন। তবে ফরাসী জনগণের ভয়ে তিনি নেপোলিয়নকে বন্দী করার অনুমতি দিতে পারেন নি। তাই ফোচে ডিউক অব ওয়েলিংটনের সাথে গোপনে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। ওয়েলিংটনকে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফ্রান্সকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখার জন্য পরামর্শও দিলেন ফোচে। যাতে নেপোলিয়নকে বন্দী করলেও দেশের জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবার সুযোগ না পায়।

নেপোলিয়ন ইচ্ছে করলে আবার অস্ত্রধারণ করে ব্লুচার ও ডিউক অব ওয়েলিংটনের সৈন্যদের পরাজিত করে ওয়াটারলুর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তিনি সৈনিক। যুদ্ধের কামানের গর্জন তাঁর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হলে তাঁর রক্ত গরম হয়ে উঠে। যুদ্ধের উন্মাদনায় তাঁর মন ওঠে নেচে। বিশেষত স্বদেশের মুক্তিকল্পে এখনো শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

বিশ্বাসঘাতক ফোচে প্রতিনিধিসভাকে বুঝিয়ে দিলেন যে নেপোলিয়নকে এ ব্যাপারে সুযোগ দিলে তিনি আবার ফ্রান্সের মাটিতে রক্তগঙ্গা বয়ে দেবেন। দেশের শান্তি করবেন বিঘ্নিত। তাই ফোচে ছলে, বলে, কৌশলে নেপোলিয়নকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বা তাঁর মৃত্যু ঘটাবার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা ভেতরে ভেতরে তৈরী করে ফেললেন। এবং বুরবোঁ সম্রাট অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন।

নেপোলিয়ন ক্ষোভে দুঃখে কলিনকোর্টকে বলেই ফেললেন যে, ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভা যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবার পূর্বেই ৩ কোটি ২০লক্ষ ফরাসীবাসীকে গর্বোদ্ধত সম্রাটের চরণতলে লুণ্ঠিত হতে বাধ্য করছে। এই সভা ফোচের প্ররোচনায় আজ যে হীনতা প্রকাশ করতে যাচ্ছে এর তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

সম্রাট ক্ষণকাল চুপ করে থাকলেন। তিনি বলে চললেন যে

তাঁর জীবনের সব আশাভরসা ফুরিয়ে গেছে। এখন তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—তবুও ফোচে মনে করছেন তিনি হয়ত আবার সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করার চেষ্টা করছেন।

এমন সময় সহসা প্রাসাদ প্রাঙ্গণে একটি শকট এসে উপস্থিত হলো। সে শকটে করে নেপোলিয়নকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা ফোচে করে রেখেছিলেন। নেপোলিয়ন নির্বিবাদে শকটে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তাঁর চোখদুটি ছল ছল করে উঠল। কলিনকোর্ট, কার্ণট প্রভৃতি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি হরতেন্সের কাছে গেলেন। এই কয়দিন ম্যালমাইসনের প্রাসাদে যোসেফাইন কন্যা হরতেন্সই তাঁকে দেখাশুনা করেছেন।

হরতেন্সের সাথে দেখা করতে গেলে—হরতেন্স কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নেপোলিয়নও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। অশ্রুসিক্ত নয়নে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শকটে উঠলেন।

পথে কোন বিপদ ঘটতে পারে এই চিন্তায় নেপোলিয়নের বন্ধুরা অস্থির হয়ে পড়লেন। নেপোলিয়ন কোনোদিন স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেননি যে ফরাসীভূমি থেকে পাঁচ সহস্র মাইল দূরে সেন্ট হেলেনায় তাঁকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হবে। হরতেন্স শুধু কাতর হৃদয়ে দূর থেকে শকটের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন।

৩রা জুলাই শকট নেপোলিয়নকে নিয়ে রকফোর্ট নগরে এসে উপস্থিত হল। পথে অবশ্য তাঁকে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁর অগণিত শুভানুধ্যায়ী তাঁকে জানিয়েছেন তাঁদের প্রাণ ভরা ভালবাসা, নিবেদন করেছেন তাঁদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। রকফোর্টেও তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দ তাঁকে জানিয়েছেন তাঁদের প্রাণের অপার ভালবাসা। নেপোলিয়ন রকফোর্টবাসীদের

জন্য যা করেছেন তার জন্য তারা নেপোলিয়নের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

অগণিত ফরাসী প্রজামণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁর হৃদয়ের বেদনা এতটুকু কমাতে পারল না। তিনি ফরাসীভূমির ও তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড়ই কাতর। ৮ই জুলাই তারিখে তিনি খবর পেলেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য সাল ও মেডুসা নামক দুটি জাহাজ প্রস্তুত। স্থির হল এই জাহাজ দুটি তাঁকে সমুদ্র পার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

৮ই জুলাই বিকেল ৪টায় তিনি সাল জাহাজের একখানি তরণীতে আরোহণ করলেন। তরণী থেকে জাহাজখানিতে উঠে তিনি শয়নাগারে বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করলেন। সেদিন সমুদ্র ছিল উত্তাল। নেপোলিয়ন দেখলেন জাহাজ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। জাহাজ নোঙর তুলল না। নেপোলিয়ন জাহাজের কাপ্তানকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন—তিনি বললেন সহসা ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশসহ তাঁর জন্য জাহাজ আসবে।

তাঁদের নির্দেশ পেলেই তাঁরা নেপোলিয়নকে নিয়ে তাঁদের নির্দেশমত সে পথেই যাত্রা করবেন। নেপোলিয়ন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং মনে মনে আনন্দ অনুভব করলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন হয়ত আমেরিকা যাবার একটি সুযোগ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দেবেন।

১১ই জুলাই বিটিশ রণতরী বেলেরোফোন জাহাজ এসে উপস্থিত হল। লাসকাস ও ডিউক অব রোভিগো বেলেরোফোন জাহাজে গিয়ে নেপোলিয়নের নির্দেশে জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ডের কাছে সন্ধি প্রস্তাব দিলেন। এবং নেপোলিয়নকে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ জানালেন।

মেইটল্যাণ্ড ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি উত্তর দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নেপোলিয়নের জাহাজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং নেপোলিয়নের জাহাজ যদি ফরাসী সমুদ্র ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করে তবে যেন তার

গতিরোধ করে নেপোলিয়নকে বন্দী করা হয়। অতএব মেইটল্যাণ্ডের পক্ষে এই আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

১৪ই জুলাই নেপোলিয়ন আবার তাঁর জেনারেল সাভারী ও লাসকাসকে বেলেরোফোন জাহাজে প্রেরণ করলেন। তাঁদের মেইটল্যাণ্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সম্রাট যদি ইংলণ্ডে যেতে রাজি থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে শ্বেত দ্বীপে নিয়ে যেতে সম্মত আছেন। নেপোলিয়নের সাথীরা তাঁকে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে অনুরোধ করলেন।

নেপোলিয়ন এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি গর্গাড ও লাসকাস নেপোলিয়নকে এ প্রস্তাব মেনে নিতে নিষেধ করলেন। তাঁরা দুজনে তাঁকে আরও বুঝালেন যে, ধূর্ত বিটিশ রাজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

এভাবে নেপোলিয়ন যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারছিলেন না—সে সময় হঠাৎ জেনারেল বেকার এসে তাঁকে খবর দিলেন যে সম্রাট অষ্টাদশ লুই-নেপোলিয়নকে গ্রেপ্তার করার জন্য রকফোর্ট অভিমুখে সৈন্যসহ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের পাঠিয়েছেন। এ খবর অবগত হয়ে নেপোলিয়ন বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে শ্বেত দ্বীপে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

১৬ই জুলাই গর্গাড এবং লাসকাস মারফৎ বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ডের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডের রাজা ৪র্থ জর্জের কাছে। এই চিঠি নিয়ে ইংলণ্ডে যাবার জন্য জেনারেল গর্গাডের ওপর ভার অর্পণ করা হল। নেপোলিয়ন চিঠিতে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে লিখলেন, "Royal Highness,—Exposed to the factions which divide my country, and to the hostility of the principal Power of Europe, I have terminated my

political career, and I came, like Themistocles to sit down at the friends of the British people. I place myself under the protection of their laws, which I claim from Your Royal Highness as the most powerful, the most constant, and the most generous of my enemies"

—Napoleon Bonaparte by Abbott. page—544

এ চিঠিতে নেপোলিয়নের মনের গভীর বেদনা ফুটে উঠেছে এবং ব্রিটিশ আইনের ওপর তাও যে একটা গভীর বিশ্বাস ছিল তাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের এ বিশ্বাস যে কতখানি ভ্রান্ত তা ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী কার্যকলাপই প্রমাণ করল। গর্গাড এই চিঠি নিয়ে ইংলণ্ডে যাবারও অনুমতি পেলেন না—ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। অন্য একজনের মারফৎ এই চিঠি ইংলণ্ডের রাজার কাছে প্রেরণ করা হল। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মেইটল্যাণ্ড ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও সাধুপ্রকৃতির লোক। নেপোলিয়নের অনুরোধে তিনি নেপোলিয়নকে নিয়ে বেলেরোফোন জাহাজে করে ইংলণ্ডের দিকে রওনা হলেন।

২৫শে জুলাই বেলা ৯টায় নেপোলিয়নকে নিয়ে বেলেরোফোন জাহাজ টরবে বন্দরে নোঙর করল। নেপোলিয়নকে নিয়ে বেলেরোফোন জাহাজ টরবে বন্দরে নোঙর করেছে—এ খবর ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়লে—ইংলণ্ড থেকে দলে দলে লোক নৌকোযোগে এসে বেলেরোফোন জাহাজের আশে পাশে ভিড় করতে আরম্ভ করলেন নেপোলিয়নকে দেখার জন্য এবং তাঁকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য। নেপোলিয়ন এই সমস্ত সুধীজনকে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতেন। সকলেই নেপোলিয়নকে তাঁদের আন্তরিক

সহানুভূতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন।

বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ড ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে নেপোলিয়নের এক অতি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জাহাজের সকলেই তাঁকে সম্রাট বলে সম্বোধন করতো। নেপোলিয়ন জাহাজের ডেকের উপর উঠে দাঁড়ালে তারা তাঁকে তাদের মাথার টুপি খুলে নতমস্তকে অভিবাদন করে সম্মান জানাত।

মেইটল্যাণ্ডের সাথে সম্রাটের এমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে সম্রাট তাঁকে তাঁর মনের সব কথা খুলে বলতেন। সম্রাট তাঁর স্ত্রী মেরিয়া ল্যুইসা ও পুত্রের (যাঁকে রোমের নরপতি নামে অভিহিত করা হতো) ছবি দেখিয়ে মেইটল্যাণ্ডের কাছে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী বলে যেতেন। মেইটল্যাণ্ড মনোযোগ সহকারে সম্রাটের সবকিছু শ্রবণ করতেন। কোন সময়ও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। নেপোলিয়ন তাঁর জীবনের কথা বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতেন—আর স্ত্রী পুত্রের কথা মনে করে অঝোরে কাঁদতেন।

প্লাইমাউথ বন্দরের কর্ণধার ছিলেন এডমিরাল কেইথ (Keith)। ইংলণ্ডের একজন নামকরা নৌযোদ্ধা। নেপোলিয়নের গুণ-মুগ্ধ। সম্রাট নেপোলিয়নের 'টরবে' পোতাশ্রয়ে আগমনের কথা জানতে পেরে এডমিরাল কেইথ বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ডকে লিখলেন যে তিনি যেন সম্রাটকে জানিয়ে দেন প্লাইমাউথে কেইথ সম্রাটের জন্য জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সম্রাট প্লাইমাউথে এলে কেইথ তাঁর সব ব্যবস্থা সুচারুরূপে করে রাখবেন। সম্রাট প্লাইমাউথে এসে পৌঁছালে তাঁর যাতে কোন অসুবিধে না হয় তারজন্য তিনি ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। কেইথ (keith) চিঠিতে মেইটল্যাণ্ডকে আরও অনুরোধ করলেন তিনি যেন সম্রাটকে জানিয়ে দেন যে ওয়াটারলুর যুদ্ধে সম্রাট তাঁর আহত ও বন্দী ভাইপোর প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন এবং

সহৃদয় সম্রাট তার যেভাবে চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সে কথা কেইথ কোনদিনও ভুলতে পারবেন না। বন্দী ও আহত শত্রু সৈন্যের প্রতি এরকম করুণা প্রদর্শন নেপোলিয়নের মত মহান সম্রাটের কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারও কাছে পাওয়া যেত কিনা কেইথ বলতে পারেন না। সত্যি এ সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে নেপোলিয়নের মহৎ হৃদয়ের তুলনা মেলা ভার।

বেলেরোফোন জাহাজ নেপোলিয়নকে নিয়ে ২৫শে জুলাই রাত্রিতে প্লাইমাউথ পোতাশ্রয়ের দিকে রওনা হল। পরদিন দুপুর ১২টার নাগাদ জাহাজ প্লাইমাউথ বন্দরে নোঙর করল। এই কয়দিনে নেপোলিয়ন বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য অফিসার ও কর্মচারীদের সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সমস্ত ইংরেজ তাঁকে দেখার জন্য নৌকো যোগে এসে 'টরবে' পোতাশ্রয়ের আশে পাশে ভিড় জমিয়েছিল—তাঁদের ব্যবহারেও।

কিন্তু প্লাইমাউথে এসে মেইটল্যাণ্ডের মধ্যে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন নেপোলিয়ন লক্ষ্য করলেন। মেইটল্যাণ্ডকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর মনের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন চলছে। মেইটল্যাণ্ডের মনের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন নেপোলিয়নকেও চিন্তিত করে তুলল। নেপোলিয়নের সাথীরা বিষণ্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। নেপোলিয়নের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে কোন এক অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। প্লাইমাউথেও প্রচুর ইংরেজ নৌকো যোগে আসতে লাগল নেপোলিয়ন সন্দর্শনে। মেইটল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের কড়া নির্দেশে কাকেও নেপোলিয়নের সাথে দেখা করার অনুমতি দিতে পারলেন না। ইংলণ্ডের সুধীবৃন্দ বিটিশ সরকারের এরূপ ব্যবহারে ও নির্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এবট তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, " Had the British Government been

apprehensive that the English people would rise and seize Napoleon and make him their king, they could not have adopted more rigorous precautions."

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে নেপোলিয়নকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকার কথা প্রকাশিত হতে লাগল। ইংলণ্ডের প্রিভিকাউন্সিল নেপোলিয়নকে অষ্টাদশ লুইর হাতে সমর্পণ করে তাঁকে সামরিক বিচারালয়ে বিচারের ব্যবস্থা করার কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। এমন কি তাঁকে সামরিক বিচারালয়ে বিচার করে গুলি করে হত্যা করার কথাও প্রিভিকাউন্সিল চিন্তা করেছিলেন। আবার প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যদের অনেকেই তাঁকে সেণ্টহেলেনায় নির্বাসনে পাঠাবার কথা ও চিন্তা করতে লাগলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এ সমস্ত কদর্য চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র সমূহ প্রতিবাদে ফেঠে পড়ল।

ডিউক অব ওয়েলিংটন ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। দয়ামায়া তাঁর হৃদয়ে ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। নেপোলিয়নের রণনৈপুণ্য, তাঁর পাণ্ডিত্য ডিউক অব ওয়েলিংটন অপেক্ষা অনেক গুণে বেশি ছিল। মনথোলনের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে ডিউক অব ওয়েলিংটন বন্দুকের গুলিতে নেপোলিয়নকে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

নোপোলিয়নের জীবনী লেখক এবট স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ওয়েলিংটনের এরূপ সংকল্পের কথা ১৮১৫ সালের ২৪শে এবং ২৫শে জুলাই এর 'টাইমস' পত্রিকার খবর পড়লে জানতে পারা যায়।

ডিউক অব সাসেক্স ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রীতিমত বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নেপোলিয়নের প্রতি তাঁদের এই মনোভাবের খানিকটা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেপোলিয়নকে সামরিক বিচারালয়ে বিচার করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করে তাঁকে সেণ্ট হেলেনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট।

নেপোলিয়ন ইংলণ্ডে আসছেন শুনে, দেশে মহা কোলাহল পড়ে গেল। ৩০/৩২ মাইল দূর থেকে সহস্র সহস্র লোক ইয়োরোপ বিজয়ী নেপোলিয়নকে দেখার জন্য সমুদ্রতীরে সমবেত হতে লাগল। সমুদ্রতীরে সহস্র সহস্র লোক সমাগমে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বিচলিত হয়ে পড়লেন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে শত শত সামরিক বাহিনীর নৌকো বেলেরোফোন জাহাজকে পরিবেষ্টন করে রাখল। ব্রিটিশ মন্ত্রি বর্গের রাতের নিদ্রা যেন কে বা কারা কোন্ এক মন্ত্রবলে কেড়ে নিল।

তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ইংলণ্ডে নেপোলিয়নের ভক্তবৃন্দের সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডে আগমন করলে ব্রিটিশ জাহাজ থেকে পলায়ন করা তাঁর পক্ষে কোন অসুবিধে হবে না।

স্যার ওয়ালটার স্কট লিখেছেন, "বেলেরোফোনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য দুখানি রণতরী জাহাজের অদূরে স্থাপন করা হল। অষ্ট-প্রহর পাহারা দেবার জন্য প্রহরীর সংখ্যাও তিন গুণ বৃদ্ধি করা হল।"

নেপোলিয়ন তাঁর অন্তিম পরিণতি কি হতে পারে তা ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না বা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। তাঁর বন্ধুগণ ও তাঁর হিতৈষীবর্গ তাঁর জীবন সংশয়ের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে ৩০শে জুলাই ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ নিয়ে আণ্ডার সেক্রেটারী—স্যার হেনরী বাম্বুরী, এডমিরাল কেইথসহ নেপোলিয়নের সাথে দেখা করার জন্য বেলেরোফোন জাহাজে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নেপোলিয়নকে একটি স্বাক্ষর বিহীন চিঠি পাঠ করে শোনালেন। বৃটিশ সরকার সেনাপতি বোনাপার্ট সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা বাম্বুরী নেপোলিয়নকে মুখেও বললেন।

চিঠিতে লেখা ছিল নেপোলিয়ন যাতে পুনরায় ইয়োরোপের শান্তি বিঘ্নিত করার সুযোগ না পান তার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করা একান্ত প্রয়োজন। সব দিক বিবেচনা করে তাই ব্রিটিশ সরকার

তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নেপোলিয়ন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। এই চিঠিতে আরও লেখা ছিল যে সেনাপতি বোনাপার্ট তাঁর তিনজন সহচর ও ১২ জন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে এ সকল ব্যক্তিকেও নেপোলিয়নের ন্যায় বন্দীজীবনযাপন করতে হবে।

নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজের এডমিরাল স্যার জর্জ কক্‌বার্ণের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল যে তিনি যেন নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনায় নির্দিষ্ট কারাগারে রেখে আসেন। কক্‌বার্ণের ওপর আরও নির্দেশ দেওয়া হল তিনি যেন নেপোলিয়নের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেন। এবং অর্থ সোনাদানা কিছু পাওয়া গেলে তিনি সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে অফিসারদের হাতে সমর্পণ করার যেন ব্যবস্থা করেন। সে অর্থের সুদের টাকা থেকে নেপোলিয়ন ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যয়ভার বহন করা হবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তা যেমন ঘৃণ্য তেমনি অমানবিক। যেটা গণতন্ত্রের হোতা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। নেপোলিয়নকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন সুযোগ দেওয়া হলো না। হলো না তাঁর কোন বিচার। বিনা বিচারেই তাঁকে সেণ্ট হেলেনার মত এরকম একটি অস্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রেরণ করা হল—তাঁকে ঠেলে দেওয়া হলো তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে।

নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সরকারের আদেশ নীরবে শ্রবণ করলেন। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। তবে ভেতরে ভেতরে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। অন্তর্দহনে তিনি জ্বলছিলেন। ভাবতে লাগলেন এর চেয়ে বুরবোঁ সম্রাটের হাতে বন্দী হয়ে থাকাই তাঁর শ্রেয় ছিল। তিনি ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ইংরেজ সরকার তাঁকে যদি লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী করে রাখতেন বা ইংলণ্ডের কোন দুর্গে তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতেন তাহলে তিনি কোন ক্ষোভ

প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এমন একটা দ্বীপে তাঁরা তাঁকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন যেখানে তিল তিল করে তাঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর চেয়ে সম্মুখ সমরে তাঁর ওয়াটারলুর যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করাই উচিত ছিল। কিম্বা ব্রিটিশ সরকার যদি তাঁকে গুলি করে হত্যা করতেন তাতেও তাঁর পক্ষে মঙ্গল হতো। সেণ্ট হেলেনায় গিয়ে তখন ত তাঁকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।

নেপোলিয়ন বলে চললেন, "আমি ইংলণ্ডের অতিথি, তাঁর বন্দী নই। আমি স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তাঁরা আমার ক্ষেত্রে তাঁদের নিজের দেশের আইনভঙ্গ করেছেন। এবং তাঁরা আমার ক্ষেত্রে তাঁদের আতিথেয়তার পবিত্র কর্তব্য পালন করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। আমি তাঁদের এরূপ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং মহামান্য ব্রিটিশ রাজের কাছে আমার ব্যাপারে সহৃদয়তার পরিচয় দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

বেলেরোফোন জাহাজের কর্মচারীরা নেপোলিয়নের ব্যবহারে বিগলিত, মুগ্ধ। তারা তাদের মন্ত্রিসভার নেপোলিয়নের প্রতি এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ইংলণ্ডের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নেপোলিয়নকে ব্রিটিশ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ইংলণ্ডের দুটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক নেপোলিয়নের প্রতি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার এরূপ ঘৃণ্য নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

ইংলণ্ড সমুদ্রে 'বেলেরোফোন' জাহাজের আশে পাশে নৌকো যোগে নেপোলিয়ন সন্দর্শনে দলে দলে ইংরেজরা আসতে লাগল। আসতে লাগল আইরিশ ও অন্যান্য দেশের লোকেরাও। বেলেরোফোন জাহাজের আশে পাশে এইজন্য এত ভিড় জমতে আরম্ভ করল যে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে নির্দেশ দিলেন যে নেপোলিয়নের হিতৈষী এ সমস্ত লোকজনদের সরিয়ে দেবার জন্য যেন বন্দুকের সাহায্য নেওয়া হয়। সরকারের নির্দেশানুযায়ী বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে বেলেরোফোন জাহাজের

আশে পাশের লোকভর্তি নৌকোগুলিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। নেপোলিয়নের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের এরকম অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্তদের আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি যে, নেপোলিয়নের প্রতি ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ এরূপ শ্রদ্ধাশীল এবং ব্রিটিশ সরকারের নেপোলিয়নের প্রতি এরূপ অবিবেচনা প্রসূত নির্দেশে তারা ক্রোধে ফেটে পড়বে। নেপোলিয়ন এই সমস্ত দেখে ভেবেছিলেন হয়ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে তাঁর ওপর সেন্ট হেলেনায় বন্দীজীবনযাপনের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা বিফলতায় পর্যবসিত হল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর নির্দেশের একচুলও অদলবদল করলেন না। "Napoleon began to be cheered by the hope that despotism of the Government would be compelled to yield to the pressure of Public opinion"-Abbott.

তবে ইংরেজ সরকার নিজেদের ভুল বুঝতে পারেননি একথা বলা যায় না। ইংরেজ সরকার নিজেদের অপরাধী বলে মনে করতে লাগলেন। এবং এটা যে তাঁরা তাঁদের দেশের আইনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন তা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন। Abbott লিখেছেন, "The English Government felt so embarrassed by the conscious guilt, that a year after, they passed a law to sanctify the crime."

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাকিনটোশ তাঁর ইংলণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থে নেপোলিয়ন এবং স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর ব্রিটিশ আদালতে বিচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কেউ ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন না এবং ব্রিটিশ আইনের চোখে তাঁরা কেউ দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারেন না। ব্রিটিশ আইনের দ্বারা তাঁরা কেউ সাজাও পেতে পারেন না। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নকে বন্দীজীবন যাপনের

জন্য নির্দেশ দেওয়া ব্রিটিশ আইনের লঙ্ঘনের সামিল।

ইংলণ্ডের আইন বিশারদগণ নেপোলিয়নকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার এরূপ নির্দেশের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য দুটি পথ স্থির করে রাখলেন। এবং তাঁরা তাঁকে ব্রিটিশ আইনের মধ্যে এনে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। এর একটি হচ্ছে নেপোলিয়নকে "হেবিয়াস কর্পাস" এর আশ্রয় নিয়ে ইংলণ্ডের আদালতে দরখাস্ত করতে তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন।

এ সমস্ত জিনিস থেকেই এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নেপোলিয়নকে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরা গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হচ্ছে দেখে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বেলেরোফোন জাহাজকে নেপোলিয়নসহ দূর সমুদ্রে চলে যাবার নির্দেশ পাঠালেন। যাতে নেপোলিয়নকে দেখার জন্য তাঁর কোন হিতৈষী ব্যক্তি নৌকোযোগে বেলেরোফোন জাহাজের কাছে যেতে না পারে। কাপ্তান মেইটল্যাণ্ড ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে গেলেন। চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ সময় আরম্ভ হলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। নেপোলিয়নকে দেখার জন্য আর কোন লোক নৌকোযোগে বেলেরোফোন জাহাজের কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেল না।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেপোলিয়নকে বেলেরোফোন জাহাজ থেকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজে তোলা হবে এবং স্যার জর্জ ককবার্ণের নেতৃত্বে নেপোলিয়নকে নিয়ে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজ সেণ্ট হেলেনায় পাড়ি দেবে। ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণের বাধা উপেক্ষা করে নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনায় পাঠাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা।

নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড মার্শাল বারট্রাণ্ড, কাউণ্ট মনথোলন এবং লাসকাসকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। কারণ তিনি ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশমত তিন জনের বেশি অফিসার সঙ্গে নিয়ে

যেতে পারবেন না। কিন্তু গর্গাড অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন সম্রাটের সাথে যাবার জন্য। সম্রাট বাধ্য হয়ে লাসকাসকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী করে নিয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে গর্গাডের তাঁর সাথে যাবার আর কোন অসুবিধে রইল না। এছাড়া তিনি তাঁর সাথে আরও ১২ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নিয়ে যাবারও অনুমতি পেয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত খানসামা মার্চেণ্ড।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ককবার্ণ কেইথকে সঙ্গে নিয়ে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজযোগে বেলেরোফোন জাহাজের কাছে এলেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত তাঁদের নেপোলিয়নের সমস্ত জিনিসপত্র তল্লাসি করতে হলো। তাঁরা দুজনই এই কাজ করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। কিন্তু উপায় নেই। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তাঁদের মানতেই হবে।

তাঁরা দুজনে লজ্জায় সম্রাটের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁদের ত করার কিছুই নেই। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁদের এ রকম ঘৃণ্য কাজ করতে হচ্ছে। যার জন্য তাঁরা মনে মনে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ওপর ক্ষুব্ধ। তবে সরকারি অফিসার হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ত তাঁরা কোন ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন না। "With crimson cheeks and faltering speech he (Keith) informed Napoleon that he was ordered to search his luggage and that of his suite and to take his all the money that could be found"

—Napoleon Bonaparte by Abbott

Page 548

"সলজ্জিতভাবে ও কম্পমান স্বরে কেইথ নেপোলিয়নকে বললেন যে তিনি নেপোলিয়নের জিনিস পত্র তল্লাসি করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছেন। এবং তাঁর ওপর এই নির্দেশ ও দেওয়া হয়েছে

যে তল্লাসি করে যদি কোন টাকা পয়সা পাওয়া যায় তাও যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়।"

অবশ্য এই কথাও কেইথ সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন যে, যে অর্থ পাওয়া যাবে সে সব অর্থ তাঁদের কাছে গচ্ছিত থাকবে। সম্রাট যাতে পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় আবার সৈন্য সংগ্রহ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারেন সে সমস্ত কথা চিন্তা করেই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেইথ সম্রাটকে আরও বললেন তিনি ইচ্ছে করলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এ সম্পদ অন্য কাকেও উইল করে দিয়ে যেতে পারবেন। সে সঙ্গে কেইথ একথা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁকে বন্দীকরে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এটা হচ্ছে তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ।

এরপর ককবার্ণ ও কেইথ তাঁদের কর্তব্যসম্পাদন মানসে সম্রাটের কাছে তাঁর জিনিসপত্র তল্লাসি করার অনুমতি চাইলেন। সম্রাট একটি কথাও বললেন না। নীরবে তাঁদের মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন। আর ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল।

নেপোলিয়নের খানসামা মার্চেণ্ড নেপোলিয়নের সমস্ত জিনিসপত্র খুলে খুলে কেইথ ও ককবার্ণকে দেখাতে লাগলো। নেপোলিয়নের ট্রাঙ্ক খুললে দেখা গেল যে সেখানে প্রচুর সোনা লুকায়িত রয়েছে। যার দাম প্রায় একশত হাজার ফ্রাঙ্ক। এসমস্ত সোনা বাজেয়াপ্ত করা হল। আর তার মধ্যে থেকে মাত্র ১২ হাজার ৫০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের সোনা সম্রাটের হাতে দেবার জন্য মার্চেণ্ডকে নির্দেশ দিলেন ককবার্ণ। এই টাকাটা সম্রাটের হাতে দেওয়া হল তাঁর ভৃত্যদের খরচপত্র মিটাবার জন্য। "About one hundred thousand francs were taken in gold from the trunks. Twelve Thousand and five hundred francs in gold were left

in the hands of Marchand, for his masters present use in remunerating his servants."—Napoleon Bonaparte by Abbott—P—549

লাসকাস, মনথোলন, বারট্রাণ্ড এঁরা এ দৃশ্য অবলোকন করে স্থির থাকতে পারলেন না। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কেবলমাত্র সম্রাটের সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এর পর এলেন এডমিরাল কেইথ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সসম্ভ্রমে কেইথ সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর তরবারিটি চাইলেন। Abbott তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "Lord Keith, in obedience to command for which his soul revolted, in a voice tremulous with embarrassment and shame, said England demands your sword". কেইথের এই কথা শুনে নেপোলিয়নের চোখদুটি ক্রোধে জ্বলে উঠল। সম্রাট সোজা উত্তর দিলেন তিনি তাঁর তরবারি দেবেন না। এই তরবারি তাঁর শৌর্য্য বীর্যের প্রতীক। নেপোলিয়নের সর্বাঙ্গ অপমানে ও ক্ষোভে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

কেইথ তাঁর সরকারের এ সব নির্দেশের জন্য নিজেকেই ছোট মনে করছিলেন। কিছুক্ষণ সলজ্জিত ভাবেও নত মস্তকে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন সম্রাট তাঁর তরবারি কিছুতেই দেবেন না—কেইথ ধীরে ধীরে অবনত শিরে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

কেইথের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি এটা ঠিক কাজ করেননি। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী কেইথকে বললেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যেভাবে হোক নেপোলিয়নের তরবারি হস্তগত করতে হবে। কিন্তু কেইথ সেটা অমান্য করলেন। এটা কি ঠিক কাজ হয়েছে?

কেইথ তাঁর সেক্রেটারীকে ধমক দিয়ে বলেদিলেন তিনি তাঁর

অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে কথা বলছেন। অতএব তাঁর কাছ থেকে কেইথ আর একটি কথাও শুনতে চান না। কেইথ তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। অতএব তাঁর সেক্রেটারীর এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই।

নেপোলিয়ন এর পর বেলেরোফেন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ডকে খবর দিয়ে পাঠালেন। মেইটল্যাণ্ড সম্রাটের অনুরোধে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। সম্রাট মেইটল্যাণ্ডকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বললেন যে, বেলোরোফেন জাহাজের কাপ্তান মেইটল্যাণ্ড ও তাঁর সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর কাছ থেকে তিনি যেরূপ ব্যবহার পেয়েছেন তাতে তিনি মুগ্ধ, তিনি বিগলিত। তাদের এরূপ ব্যবহারের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেপোলিয়ন জানেন না।

নেপোলিয়ন স্পষ্ট ভাষায় মেইটল্যাণ্ডকে জানিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের নেপোলিয়নের প্রতি এরকম অভদ্রোচিত ব্যবহার এটা প্রমাণ করে না যে ইংলণ্ডের সব অধিবাসী এ রকম অভদ্র আচার আচরণে অভ্যস্ত।

সম্মানিত ব্যক্তিকে কিভাবে সম্মান দেখাতে হয় ইংলণ্ডের বেশির ভাগ লোকই তা জানেন। তাঁর পরিচয় তিনি বেলেরোফোন জাহাজের কাপ্তান ও তাঁর কর্মচারীদের ব্যবহারের মধ্যেই পেয়েছেন। তদুপরি যে সমস্ত ইংল্যাণ্ডবাসী তাঁকে দেখার জন্য নৌকোযোগে এসে বেলেরোফোন জাহাজের আশে পাশে প্লাইমাউথ বন্দরে ভিড় জমিয়েছিল তাদের মানাসিকতাও নেপোলিয়নকে মুগ্ধ করেছে। নেপোলিয়নের প্রতি তাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নেপোলিয়নকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের, আইনজীবীদের এবং বহু সুধীজনের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন ও তাঁকে করেছে বিমোহিত। তাই তিনি বলে গেলেন যে ইংলণ্ডবাসী সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে জানে,

নিবেদন করতে জানে তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। তারপর সম্রাট তাঁর মাথার টুপি খুলে আর একবার অভিবাদন করলেন মেইটল্যাণ্ড ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দকে।

নেপোলিয়ন এবার তাঁর হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গেলেন—যাঁরা তাঁর সাথে সেণ্ট হেলেনায় যাবার অনুমতি পাননি তাঁদেরই কাছে। সম্রাটের সাথে এই বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁরা সকলেই কেঁদেই আকুল। আর লাসকাস ত চলেছেন সম্রাটের সাথে একাই। তাঁর স্ত্রীপুত্রকে ফেলে রেখে। অথচ সেদিকে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সম্রাটের সাথে যাবার অনুমতি পেয়েছেন এতে তাঁর মনে জেগেছে গভীর আনন্দ।

সম্রাট লালেমণ্ড (Lallemand) এবং ডিউক অব রোভিগোকে (Duke of Rovigo) বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁরা শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নেপোলিয়নের দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল।

হায় বিধাতা! কি তোমার অমোঘ বিধান? এই সমস্ত দেখে কি মনে হয় না যে সম্রাট কত মহৎ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তা না হলে তিনি তাঁর শত্রু ব্রিটিশরাজের এত অগণিত প্রজামণ্ডলীর কাছ থেকে কি ভাবে এরকম আনুগত্য লাভ করলেন। তাঁর সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর সুমধুর ব্যবহার, বিশ্বের নিষ্পেষিত জনগণের প্রতি তাঁর হৃদয়ের অপার ভালবাসা—সব মিলে আজ তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটের আসনে সমাসীন। ফরাসী সরকার স্যাভারি এবং লালেমণ্ডকে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারও তাঁদের নেপোলিয়নের সাথে সেণ্টহেলেনায় যাবার অনুমতি দিলেন না। এই অবস্থায় তাঁদের সামনে একমাত্র মৃত্যুর পথই খোলা রইল। তাঁদের অপরাধ ছিল সম্রাট নেপোলিয়নের প্রতি তাঁদের আনুগত্য।

পয়নটকোস্‌কি ছিলেন একজন পোলিশ অফিসার। তিনি

কেইথকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন যে তিনি নেপোলিয়নের সাথে সেণ্ট হেলেনায় যেতে প্রস্তুত। তাঁকে যেন নেপোলিয়নের সাথে সেন্টহেলেনায় যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কেইথ এতে সম্মতি দিতে পারলেন না কেন না এটা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে নেই।

ডঃ ওমিয়ারা ছিলেন বেলেরোফোন জাহাজের ডাক্তার। জাতিতে আইরিশ। তিনি সেন্টহেলেনায় নেপোলিয়নকে দেখা শোনা করতে ডাক্তার হিসেবে যাবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন। ডঃ ওমিয়ারা এর জন্য নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন।

৯ই আগষ্ট সকাল ১১টায় ককবার্ণ ও কেইথ নেপোলিয়নকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজে ওঠার জন্য অনুরোধ করলেন। নেপোলিয়ন নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজে আরোহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেলেরোফোন জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন। জাহাজের নৌ-বাহিনীর লোকেরা সামরিক কায়দায় তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেপোলিয়নের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ ছিল নেপোলিয়নকে যেন সম্রাট নামে অভিহিত করা না হয়। সাধারণ সেনাপতি হিসাবেই যেন তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়। কেন না তাদের মতে নেপোলিয়ন বন্দী। সম্রাটের মর্যাদা তিনি পেতে পারেন না।

নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজে ওঠার সময় আর একবার নেপোলিয়ন কাপ্তান মেইটল্যাণ্ড ও বেলেরোফোন জাহাজের উপস্থিত কর্মীবৃন্দকে তাঁর মাথার টুপি খুলে অভিবাদন করলেন, জানালেন তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। নেপোলিয়ন বললেন, "Captain Maitland, I take this last opportunity of thanking you for the manner in which you have treated me while on board the 'Bellerophon' !"—J. S. C. Abbott.

বেলেরোফোন জাহাজের কর্মীরা নেপোলিয়নকে বিদায় জানাতে এলেন। সকলের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছন

পেছন চলেছেন ফরাসী জেনারেল বারট্রাণ্ড লাসকাস ও মনথোলন। আর বারট্রাণ্ড ও লাসকাসের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। আর নেপোলিয়নের খানসামা মার্চেণ্ড ও আরও ১১ জন ভৃত্য। সঙ্গে আছেন জেনারেল গর্গাড ও ডাঃ ওমিয়ারা।

এঁদের নিয়েই এখন নেপোলিয়নের সংসার। নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজটি ছিল বিশাল। এখানে এক হাজারের ওপর কর্মচারী (অফিসার সহ) কাজ করত। নেপোলিয়ন জাহাজে ওঠার সাথে সাথে জাহাজের কর্মচারীরা তাঁকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাল। বেজে উঠল সামরিক বাহিনীর বাদ্যযন্ত্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠবীর নেপোলিয়নকে সম্মান জানাবার জন্য জাহাজের সব কর্মীরা সারিবদ্ধ-ভাবে সুশৃঙ্খল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। ধর্মীয় আচার আচরণে যেরূপ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা মানুষ জ্ঞাপন করে ভগবানের উদ্দেশে, নেপোলিয়নের আগমনের সাথে সাথে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজের কর্মীদের মধ্যেও যেন সে রকম একটি ভাবের উদয় হল।

নেপোলিয়ন তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা সহকারে তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। অল্পকথার তাঁদের সামনে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তারপর চলে গেলেন জাহাজে তাঁর জন্য সংরক্ষিত নিজের কক্ষে। সেখানে নেপোলিয়ন জেনারেল কেইথের (Keith) সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এমন সময় ককবার্ণ এসে হাজির হলেন।

ককবার্ণ এসে নেপোলিয়নকে জানালেন ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ হচ্ছে নেপোলিয়নকে যেন সম্রাট বলে সম্বোধন করা না হয়। কারণ তিনি হচ্ছেন সমগ্র ইয়োরোপের শান্তি ভঙ্গকারী পররাজ্য গ্রাসকারী সেনানায়ক, এখন ব্রিটিশদের হাতে বন্দী। ককবার্ণ বললেন ব্রিটিশরাজের নির্দেশ তাঁকে যেন কেবলমাত্র জেনারেল নেপোলিয়ন বলে সম্বোধন করা হয়।

নেপোলিয়ন ককবার্ণকে বললেন, "They may call me

what they please, they can not prevent me from being myself.

এবট তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার নেপোলিয়নকে সম্রাট বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করে যে নির্দেশ দিলেন তাতে তাঁরা নিজেদের বিশ্ববাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করলেন। এতে তাঁদের গৌরব বৃদ্ধি হয়নি বরঞ্চ তাঁরা নিজেরা নিজেদের অত্যন্ত নিচ প্রবৃত্তির মানুষ বলে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিপন্ন করলেন। এটা সমগ্র ব্রিটিশ জাতির পক্ষে কলঙ্কজনকও বটে।

১৮১৫ সাল। ৯ই আগষ্ট। ব্রিটিশ রণতরী নার্দম্বারল্যাণ্ড জাহাজে করে নেপোলিয়নকে নিয়ে চলল সেণ্ট হেলেনার নির্জন দ্বীপে। তার সঙ্গে ছিল আরও কয়েকটি ছোট ছোট জাহাজ। কিছুক্ষণ পর নেপোলিয়ন নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজের ডেকের ওপর এসে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয়তমা ফরাসী ভূমির দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন। তাঁর দুই চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তাঁর ফরাসী অনুচরেরা সমস্বরে মাতৃভূমি 'ফ্রান্স' 'ফ্রান্স' বলে শেষবারের মত বলে উঠল। নেপোলিয়ন কয়েক মিনিট সতৃষ্ণ নয়নে ফ্রান্সের তটভূমির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটি ঝাপ্সা হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি তাঁর মাথার টুপিটি হাতে নিয়ে অবনত মস্তকে দূরে মাতৃভূমি ফ্রান্সকে প্রণাম জানালেন। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বীরভোগ্যা ফ্রান্স, আমি তোমায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি। বিদায়। হে আমার প্রিয়তমা ফ্রান্স বিদায়"।

উপস্থিত ইংরেজগণ নেপোলিয়নের এরকম মানসিক অবস্থা সন্দর্শনে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। বীর নেপোলিয়নের অবস্থা দেখে তাঁদের চোখেও জল এসে গেল। তাঁরাও অবনত মস্তকে মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে ফরাসী ভূমিকে নেপোলিয়নের ন্যায় সম্মান জানালেন। নেপোলিয়নের এ অভূতপূর্ব আচরণে উপস্থিত ইংরেজদের শরীরে যেন

তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। দেশভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হতে পারে? জাহাজে নেপোলিয়নের সকলের সাথে এরূপ সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহার, তাঁর মহৎ চরিত্র সবশ্রেণীর, সবদেশের, উপস্থিত অধিবাসীদের মনে এমন ভাবে দাগ কাটল যে তারা বুঝতে পারল শত্রু হস্তে বন্দী হলেও নেপোলিয়নের জীবন কলঙ্কিত বা ব্যর্থ হয়নি।

নেপোলিয়ন তাঁর কেবিনে একাকী আহার করতেন। তারপর শত্রু মিত্র উপস্থিত সকলের সাথে কথোপকথনে কিছু সময় কাটিয়ে দিতেন। বিকেলে সর্বসাধারণের কেবিনে এসে তাদের সাথে দাবা খেলায় আধঘণ্টা সময় কাটাতেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁকে আহারের জন্য ডাকতেন। নেপোলিয়ন তাঁর সহযাত্রিগণকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের আহারের সময় টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে থাকতেন।

নেপোলিয়ন লঘুপাক খাদ্যই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। নেপোলিয়ন সময় সময় জাহাজের ডেকের ওপর পায়চারি করতে করতে সহযাত্রিদের সাথে তাঁর জীবনকাহিনী, তাঁর জয় পরাজয়ের ইতিহাস সবিস্তারে বলে যেতেন। সহযাত্রিরা তাঁর জীবনকাহিনী গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতেন। নেপোলিয়ন কিন্তু কোন সময়েই তাঁর জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। জাহাজের ইংরেজ কর্মচারী বা খালাসীরা নেপোলিয়নের এরকম সদয় ব্যবহার ও মহৎগুণের কথা জানতেন না। এত বড় যোদ্ধা, এত বড় ব্যক্তিত্বপূর্ণ সম্রাট অথচ শিশুর মত সরল মানসিকতার লোক তারা এর আগে কোনদিন দেখেনি। তারা তাই নেপোলিয়নকে জানালো তাদের হৃদয়ের অপার ভালোবাসা, গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা। J. S. C. Abbottএর ভাষায় বলা যায় "Every sailor felt that there was a bond of union between him and the Emperor. The soldiers of the fifty third regiment, Who were on the passage to St.

Helena to guard his prison and the crews of the ship, were all apparently as devoted to him as French soldiers and French sailors would have been."

১৬ই অক্টোবর মধ্যাহ্নে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জাহাজ দক্ষিণ আটল্যান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে এসে নোঙর করল। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটি যে কেবল সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত তা নয় ইহা সব দিক থেকে সুরক্ষিত। সে সময় এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫৮০ জন। তার মধ্যে ১৫৮০ জন ছিল ইংরেজ সৈন্য। ৩০০ ক্রীতদাস। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটি ইয়োরোপ ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আর আফ্রিকার উপকূল ভাগ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২০০ মাইল। দ্বীপটি লম্বায় ১০ মাইল আর প্রস্থে ৬ মাইল। জেনারেল মনথোলন বলেছেন এমন অস্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে বিরল। লিভারের পীড়া ও আমাশা রোগ এখানের বাসিন্দাদের চিরসাথী। মনথোলন আরও বলেছেন যে, স্থানীয় অধিবাসী ও ক্রীতদাসদের জীবন এখানে পঞ্চাশের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত।

সেণ্ট হেলেনায় প্রথমে ব্রয়োর্স নামক স্থানে নেপোলিয়নের জন্য যে গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা যেমন ছোট, তেমন স্যাঁত-স্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর। তাতে সূর্যের আলো প্রবেশের কোন পথ ছিল না। এমন কি তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করার মত জায়গাও সেখানে ছিল না। আর তাঁর জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাও ছিল নিম্নমানের। দুমাস পর তাঁকে লংউডের কারাগৃহে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর কারাগৃহের দুমাইলের মধ্যে প্রথমে তাঁর কোন সহচরকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। লংউডের কারাগৃহে কি ভাবে নেপোলিয়নকে ছয় বৎসর অসহনীয় কষ্টে দিন যাপন করতে হয়েছে—ব্রিটিশরাজের প্রতিভূ হাডসনলোর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ লংউডের কারাগৃহে নেপোলিয়ন' এ অধ্যায়ে দেওয়া আছে।

লংউডের কারাগৃহে নেপোলিয়ন

সেন্টহেলেনায় বন্দীদশায় নেপোলিয়নকে প্রথম ভ্রমাস ব্রয়োর্স নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র গৃহে রাখা হয়েছিল। ১০ই ডিসেম্বর ১৮১৫ নেপোলিয়নকে লংউড নামক স্থানে নিয়ে আসা হল। লংউড স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০০ ফুট উপরে অবস্থিত। এখানে নেপোলিয়নের জন্য তৈরী করা হল নতুন কারাগার।

এ কারাগৃহটি পূর্বে পশুশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত পরে এ পশুশালাটি নতুন ভাবে সংস্কার করে নেপোলিয়নের জন্য কারাগৃহে পরিণত করা হল। পূর্বে এখানে কোন কোন সময় হয়ত রৌদ্র তপ্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক এসে কিছু সময় অতিবাহিত করে যাবার সুযোগ পেত।

স্থানটি ছিল নির্জন, জনপ্রাণীহীন ও বিপদসঙ্কুল। মনে হত গিরি কন্দরে একটি জীর্ণ কুটীর। যেখানে দিনের বেলায় ও সূর্য কিরণ প্রবেশ করে না। একদা অর্ধেক ধরণীর অধীশ্বর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়নের জন্য এ পশুশালা হল তাঁর শেষ জীবনের বাসগৃহ। তাছাড়া এ কারাগৃহে প্রচুর বড় বড় ইঁদুরের উৎপাত ছিল। জেনারেল বারট্রাণ্ডকে (নেপোলিয়নের জেনারেল) একবার একটি ইঁদুর এমন ভাবে কামড়িয়েছিল যার জন্য তাঁকে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। নেপোলিয়নের মাথার টুপির মধ্যেও প্রায় সময় ইঁদুর ঢুকে থাকত।

নেপোলিয়ন এখানে এসে প্রথম প্রথম আধ ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের অনুমতি পেয়েছিলেন। তবে তাঁকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হত না। তাঁর সঙ্গে থাকত ব্রিটিশ প্রহরী। আর দিনের বেলায় তাঁর কারগার পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত

ছিল ১২৫ জন প্রহরী, আর রাতের জন্য ৭২ জন। এছাড়া প্রায় তিন হাজার ব্রিটিশ স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সৈনিক, সেনানায়ক নৌবহর সহ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটি ঘিরে রেখেছিল, যাতে নেপোলিয়ন কোন ক্রমেই পালিয়ে যাবার সুযোগ না পান।

এরকম জীবনযাত্রা নেপোলিয়নকে ক্রমে অসুস্থ করে তুলল। নেপোলিয়ন বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন এ দ্বীপে এরকম দূষিত পরিবেশের মধ্যে রেখে ধূর্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। এরকম অবস্থায় কোন লোকের পক্ষে বেশীদিন সুস্থ শরীরে এবং সুস্থ মানসিক অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথমে দু বৎসর মোটামুটি শারীরিক দিক থেকে কিছুটা ভাল ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বৎসর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি পরিলক্ষিত হয়। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা বোধ করতে থাকেন।

নেপোলিয়ন ইংরেজী জানতেন না। জেনারেল লাসকাসের কাছে লংউডের কারাগৃহে বসে তিনি ইংরেজী শিখে ছিলেন। অফিসারদের মধ্যে জেনারেল লাসকাস, জেনারেল মনথোলন ও জেনারেল বারট্রাণ্ড এঁরাই তাঁর সাথে সেণ্টহেলেনায় বন্দী জীবন যাপন করতে তাঁর একান্ত অনুগামী ও মরমী সাথী হিসাবে ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন। জেনারেল মনথোলন এবং জেনারেল বারট্রাণ্ড তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

নেপোলিয়ন তাঁর ছোট গৃহে জেনারেল বারট্রাণ্ড, জেনারেল মনথোলন ও তাঁদের স্ত্রী সহ মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করতেন গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে। নেপোলিয়নের অস্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বই পড়ার দিকে। তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে প্রায় তিন হাজার বই ছিল। এ বইগুলি তিনি সারা দিনই সুযোগমত পড়াশুনা করতেন। আর এখানে ছিল তাঁর অফুরন্ত সময়। তিনি একটি বই এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ফেলতেন।

তিনি এ কারাগৃহে বসে স্মৃতিপট থেকে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলে যেতেন আর মনথোলন কিম্বা বারট্রাণ্ড কিম্বা তাঁদের স্ত্রীরা সেগুলি পালাক্রমে লিখে যেতেন। লংউডের আবহাওয়া ছিল স্যাঁতসেঁ'তে। প্রায় সময় ঝড় বৃষ্টি লেগেই থাকত। একজন কর্মযোগীর পক্ষে লংউডের কারাগৃহে এরকম অবসাদময় জীবন যাপন করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা কিভাবে সম্ভব?

নেপোলিয়ন আশা করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার অন্ততঃ আমেরিকায় যেতে না দিলেও ইংলণ্ডের কোন কারাগারে তাঁকে বন্দী করে রাখবেন। কিন্তু তা না করে তাঁকে এমন একজায়গায় পাঠিয়ে দিলেন যেখানে থেকে তিনি তিল তিল করে মৃত্যুর দিন গুণছেন।

এখানে এসে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। নেপোলিয়নের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করার জন্য প্রথমে নিযুক্ত করা হল আইরিশ ডাক্তার ওমিয়ারাকে।

১৫ই জানুয়ারী ১৮১৬। কাউণ্ট লাসকাস, ওমিয়ারার কাছ থেকে প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক গোল্ডস্মিথের একখানি বই এনে নেপোলিয়নকে পড়তে দিলেন। বইটির নাম "বোনাপার্টের রাজ-দরবারের রহস্য"। বইটি ছিল নেপোলিয়ন সম্পর্কে বিকৃত তথ্যে ভরা। এ বইটিতে নেপোলিয়ন সম্পর্কে এমন সব অন্যায় অভদ্রোচিত এবং অসম্মানজনক কথা লেখা ছিল যেগুলি পড়ে নেপোলিয়ন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তবে তিনি এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। কিন্তু তিনি দেখলেন কেবল তাঁর সম্পর্কে নয় তাঁর মহীয়সী জননী লেটিজিয়া সম্পর্কেও মিথ্যা কাহিনী লিপিবদ্ধ করে লেখক তাঁর বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তখন নেপোলিয়ন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ল। তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর মার ন্যায় এরকম একজন মহীয়সী নারীর প্রতি গোল্ড স্মিথের মত একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের এ ধরণের কটাক্ষ অসহনীয়। তিনি

বলে উঠলেন ভগবানের অশেষ করুণা যে এই বই তাঁর মার হাতে পড়েনি।

১৮১৬। এপ্রিল মাস। সেন্টহেলেনায় গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে এলেন হাডসন লো। তিনি লংউডের কারাগারে নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। প্রথম দর্শনেই নেপোলিয়ন হতচকিত হয়ে গেলেন। হাডসন লো ছিলেন দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত এবং অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক। তাঁর হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতির লেশমাত্র ছিল না।

হাডসন লো ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার। তিনি ভাল ফরাসী ভাষা জানতেন। নেপোলিয়ন লোর কাছ থেকে সহৃদয়তা আশা করেছিলেন। কিন্তু কার্যত তাঁর সে আশা বিফলতায় পর্যবসিত হল। নেপোলিয়ন জেনারেল বারট্রাণ্ডকে পরে বলেছিলেন যে হাডসন লোকে দেখলে সিসিলির পুলিশ কর্মচারীর কথা মনে পড়ে।

প্রথম প্রথম নেপোলিয়নের সাথে তাঁর ব্যবহার খুব একটা খারাপ ছিল না। ক্রমেই নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি আরম্ভ হয়। হাডসন লো এক হুকুম নামা জারি করলেন। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন নেপোলিয়নের যে সব অনুচর সেন্ট হেলেনায় আছে তারা ইচ্ছে করলে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। তাতে নেপোলিয়নের অনুগত সহচরবৃন্দ মত দিল না। হাডসন লো বুঝতে পারলেন নেপোলিয়নের এ সকল অনুচর তাঁকে ফেলে রেখে কেউ স্বদেশে ফিরে যাবে না।

হাডসন লোর সাথে এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে নেপোলিয়নের প্রচণ্ড মত বিরোধ হল। উত্তেজনায় নেপোলিয়নের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। হাডসন লো ডঃ ওমিয়ারাকে জানিয়ে দিলেন তিনি যেন নেপোলিয়নকে বলে দেন ব্রিটিশ সরকার নেপোলিয়নের জন্য এত ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না। নেপোলিয়নকে তাঁর ও তাঁর অনুচরবর্গের ব্যয়ভার বহন

করার জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রার) ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ তাঁর ব্যয় সঙ্কোচ করা ছাড়া হাডসন লোর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

তিনি নেপোলিয়নকে আরো জানিয়ে দিলেন যে নেপোলিয়নের জীবন-মরণ তাঁর ওপরই নির্ভরশীল। নেপোলিয়ন দশ লক্ষ লোকের জীবন হানি ঘটিয়েছেন। তাঁর জন্যই সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। অতএব তাঁর সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত। হাডসন লো আরও মন্তব্য করলেন যে তিনি নেপোলিয়নকে আলিপাশা অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক লোক বলে মনে করেন। হাডসন লো নেপোলিয়নের ভাতা কমিয়ে দিলেন। তাঁর চাকর বাকরের সংখ্যাও কমানো হল। নেপোলিয়ন শীল-মোহর করে তাঁর আর্থিক বিষয় জানিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। হাডসন লো পরিষ্কার তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নেপোলিয়নের এ চিঠি পাঠাবার অনুমতি দেবেন না। নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে সব কিছু মেনে নিতে হল।

হাডসন লো মনে করতেন নেপোলিয়নের অনেক গুপ্তধন আছে। তাঁর ওপর আর্থিক চাপ দিলে এ সমস্ত গুপ্ত সম্পদ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই তাঁর ওপর হাডসন লো এরকম নির্যাতন শুরু করেছিলেন।

লাসকাস লিখেছেন একদিন সকালে তাঁদের খাবার জন্য রুটি, মাখন, কফি, দুধ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। ক্ষুধার্ত নেপোলিয়ন এক টুকরো রুটি চেয়েও পান নি। নেপোলিয়নের যে সমস্ত দামী তৈজসপত্র ছিল তা বিক্রী করে প্রথম তিন মাস কাটল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো সম্রাটের জন্য ভাল কোন থালা বাসনও রইল না। সম্রাট এতে এতই কষ্ট পাচ্ছিলেন যে তিনি তাঁর খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত একরকম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

হাডসন লো বুঝতে পারলেন উনি যে ধারণা করেছিলেন

নেপোলিয়নের প্রচুর গুপ্তধন আছে তা ঠিক নয়। এরপর হাডসন লোর পাষাণ হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হল।

নেপোলিয়নের এরকম আর্থিক অবস্থার সংবাদ অবগত হয়ে মা লেটিজিয়া, ভগ্নি পলিন, হরতেন্স, ইউজিন ও তাঁর অন্যান্য হিতৈষীরা নেপোলিয়নের কাছে অর্থ প্রেরণ করতে লাগলেন।

এ সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য খ্যাতনামা দার্শনিক ও সাহিত্যিক জন ক্যাম হবহাউস নেপোলিয়নের জন্য একটি বই পাঠালেন। বইটির লেখক হবহাউস নিজেই। বটটির নাম 'সম্রাট নেপোলিয়নের শেষ রাজত্ব'। বইটিতে হবহাউস নিজেই স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন 'সম্রাট নেপোলিয়নের জন্য'। হবহাউস হাডসন লোর কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন বইটি যেন সম্রাট নেপোলিয়নের হাতে প্রদান করা হয়। ১৮১৫ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের শেষ রাজত্বের প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ রয়েছে বইটিতে। হাডসন লো বইটি নেপোলিয়নের হাতে প্রদান করলেন না। কারণ বইটিতে 'সম্রাট নেপোলিয়ন' কথাটি উল্লেখ আছে। একজন বন্দীকে সম্রাট বলে সম্বোধন করা হাডসনলো পছন্দ করতেন না। তিনি ঘৃণাভরে হবহাউসের এ অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। বইটি করলেন বাজেয়াপ্ত। হবহাউস এবং কবি বাইরণ ছিলেন নেপোলিয়নের পরম ভক্ত।

এরপর একদিন নেপোলিয়ন তাঁর ভৃত্য মার্চেণ্ডকে তাঁর এক জোড়া পুরানো চপ্পলসহ জ্যামসটাউনের এক মুচির কাছে পাঠালেন। এবং তিনি মার্চেণ্ডকে নির্দেশ দিলেন মুচি যেন অতি সত্বর ঐ মাপের একজোড়া চপ্পল তৈরী করে নেপোলিয়নের কাছে পাঠিয়ে দেয়। হাডসন লো এ সংবাদ অবগত হয়ে মুচিকে নেপোলিয়নের চপ্পল তৈরী করতে নিষেধ করলেন এবং বলে দিলেন নেপোলিয়নকে স্বহস্তে তাঁর পায়ের মাপ অনুযায়ী পুরানো চপ্পল দিতে হবে। নচেৎ মুচি যদি নেপোলিয়নের চপ্পল তৈরী করে দেয়—তাহলে হাডসন লো তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। এভাবে নেপোলিয়নকে প্রতি-পদেপদে

হাডসনলো অপমান করতে লাগলেন। হাডসনলোর সাথে নেপোলিয়নের মন কষাকষি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে দুজনের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। নেপোলিয়ন তাঁর এ রকম মানসিক অবস্থায় স্বীয় শিশুপুত্র ও স্ত্রী মেরিয়া ল্যুইসাকে দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ইতালীর এক বড় ব্যবসায়ী সংস্থা নেপোলিয়নের পুত্রের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি তৈরী করে সেন্টহেলেনায় প্রেরণ করেছিল। হাডসন লো সেটিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত লাসকাস, বারট্রাণ্ড ও মনথোলনের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তাঁকে শিশুপুত্রের এ মূর্ত্তিটি নেপোলিয়নের কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। নেপোলিয়ন এ মূর্ত্তিটি তাঁর কারাগৃহের এমন এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন যাতে সব সময় মূর্ত্তিটি তাঁর চোখে পড়ে।

নেপোলিয়ন সম্পর্কে লামার্টিন মন্তব্য করেছিলেন যে 'নেপোলিয়ন ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি'। কিন্তু সেন্টহেলেনায় গভর্ণর হাডসন লো ত তা স্বীকার করতে পারেন না। হাডসন লোর সাথে নেপোলিয়নের মানসিক সংঘাত, লংউডের জলবায়ু তদুপরি আর্থিক অনটন ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়ন দিন দিন দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। পেটের যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল।

ডাক্তার ওমিয়ারা আইরিশ হলেও তিনি নেপোলিয়নকে অতীব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নেপোলিয়নের চিকিৎসার যাতে ত্রুটি না হয় সে দিকে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর এত দরদ হাডসনলো সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ওমিয়ারাকে নেপোলিয়নের প্রতি এতখানি সহৃদয়তার ভাব প্রকাশ না করতে নির্দেশ দিলেন। ওমিয়ারা হাডসন লোর নির্দেশের কোন গুরুত্ব দিলেন না। ফলে হাডসন লো ওমিয়ারাকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। ২৮ দিন ওমিয়ারা কারাগারে কাটালেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ণধারগণ তখন আইলাচ্যাপলাতে বসে ইয়োরোপের

রাষ্ট্রবিন্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারে নানান আলোচনায় রত। এ সংবাদ অবগত হয়ে হাডসন লোকে তাঁরা কঠোর ভাষায় চিঠি লিখে পাঠালেন যেন ওমিয়ারাকে কারগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁরা আরও জানিয়ে দিলেন হাডসন লো যেন নেপোলিয়নের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এ চিঠিতে কাজ হয়েছিল। ওমিয়ারা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের সুচিকিৎসার যে ব্যবস্থা হলো তা বলা যায় না।

এ সময় হাডসন লোর সাথে লাসকাসের মতবিরোধ ঘটে। লাসকাস ইংলণ্ডে লেডি ক্লেভারিংয়ের কাছে গোপনে সেণ্ট হেলেনা থেকে এক ভৃত্যের মারফৎ একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠিতে তিনি নেপোলিয়নের ওপর হাডসন লোর অত্যাচারের কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। হাডসন লো এ ব্যাপারটি অবগত হয়ে লাসকাসকে সেণ্ট হেলেনা থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন।

নেপোলিয়নের অনেকদিনের মরমী সাথী লাসকাস তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন এটা নেপোলিয়ন চিন্তা করতে পারলেন না। নেপোলিয়ন লাসকাসের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। কিন্তু হাডসনলো নেপোলিয়নের এ অনুরোধ রাখলেন না। লাসকাসের সাথে নেপোলিয়নের সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে নেপোলিয়ন লাসকাসের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। সে চিঠি শীল করা ছিল। তাই হাডসন লো সেটা লাসকাসকে দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন।

নেপোলিয়ম বাধ্য হয়ে লাসকাসের কাছে খোলা চিঠি পাঠালেন। লাসকাসের সাথে নেপোলিয়নের আর ইহজীবনে দেখা হয়নি। লাসকাসের সেণ্ট হেলেনা ত্যাগ অসুস্থ নেপোলিয়নের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। গভীর দুঃখে তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা বর্ষিত হল। অসহায় নেপোলিয়ন শুধু ভাবতে লাগলেন রণক্ষেত্রে কেন তাঁর মৃত্যু ঘটল না। এরকম অসহনীয় যন্ত্রণা তাঁকে আরও কতদিন ভোগ

করতে হবে? আর কতদিন চলবে তাঁর এ নরকবাস?

১৮১৮ সালের নভেম্বর—ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়নের পীড়া আরও বৃদ্ধি পেল। বৃদ্ধা মা লেটিজিয়া তখন রোমে। ভাই কার্ডিনেল ফেচের সাথে বাস করছেন। হতভাগিনী মা বীর সন্তানের এরকম শোচনীয় অবস্থার কথা অবগত হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন। কিন্তু করার ত কিছুই নেই।

১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে লেটিজিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে তাঁর আকুল মিনতি জানিয়েছেন-পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করে, পুত্রকে এরকম নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিতে। আইলা-চ্যাপেলাতে উপস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের তিনি লিখলেন—"মহোদয়গণ, আমি নেপোলিয়নের মা, আমার ছেলের জীবন আমার নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয়। আমি ভগবানের নামে যাঁর মহিমায় এজগতের সব কিছু প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়—যাঁর প্রতিচ্ছবি আপনাদের মত সম্রাটগণের মধ্যে প্রতিফলিত—আপনাদের কাছে আকুল মিনতি জানাচ্ছি আপনারা আমার পুত্রের দুঃখের লাঘব করুন। তাকে মুক্তি দিন। আমি এজন্য ভগবানের কাছে এবং আপনারা যাঁরা এ পৃথিবীর কর্ণধার তাঁদের কাছে আমার ছেলের জন্য করুণা ভিক্ষা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কাছে আমার ছেলের প্রতি এ করুণা প্রদর্শন-আপনাদের সহৃদয়তার চিহ্নস্বরূপ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

মাতৃহৃদয়ের এ করুণ আবেদনে আইলা চ্যাপেলায় উপস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ণধার-গণের মনে এতটুকু করুণার উদয় হয়নি। নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনায়কগণ মা লেটিজিয়ার এ করুণ আবেদনে সাড়া দিয়ে একটি উত্তর দেবার পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেননি।

নেপোলিয়নের নারীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ তাঁর সেন্ট হেলেনায় অবস্থান কালেও প্রকাশ পেতো। তাঁর কথাবার্তায় নারীর প্রতি তাঁর এ মোহ বিশেষভাবে ফুটে উঠত। সেন্ট হেলেনায় গল্পচ্ছলে তিনি

বারট্রাণ্ডকে তাঁর প্রেমিকাদের সম্পর্কে অতি সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে বলে যেতেন। তিনি বলতেন দৈহিক প্রেম বা অধিক নারীর প্রতি আসক্তি থাকা কোন মানুষের উচিত নয়। কিন্তু এটা হচ্ছে সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজই মানুষকে এ আসক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করে। তিনি বলতেন ইহুদী এবং এথেনিয়ানরা তাদের নিজেদের বোনকে বিয়ে করে। তাঁর মতে মেয়েরা স্বভাবত অতি বিনয়ী হতে পারে না। মেরিয়া ল্যুইসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, মেরিয়া ল্যুইসা বিশেষ কোন বইপত্র বা উপন্যাস ইত্যাদি পড়তে ভালবাসতেন না। তাঁর অধিক আকর্ষণ ছিল দৈহিক সুখভোগের প্রতি।

নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনার যে দুজন ফরাসী রমণীর সাহচর্যে বিমোহিত হয়েছিলেন-সেই দুজন ফরাসী রমণী হচ্ছেন তাঁরই দু জেনা-রেলের স্ত্রী। বড়টির নাম অ্যালবাইন ডিমনথোলন। জেনারেল মনথোলনের স্ত্রী-যিনি তিনবার বিয়ে করেছিলেন। অ্যালবাইন ভাল গান করতে পারতেন। পারতেন ভাল পিয়ানো বাজাতে। অ্যালবাইনের গানে নেপোলিয়ন মুগ্ধ হয়ে যেতেন, মনে পেতেন আনন্দ। ক্ষণিকের জন্য পেতেন মানসিক শান্তি। ছোটটির নাম ফেনি। জেনারেল বারট্রাণ্ডের স্ত্রী। দিলনের ফ্রাংকো আইরিশ পরিবারের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ফেনি যে দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন তা নয় তবে তাঁর দৈহিক গঠন ছিল অপূর্ব। যে কোন পুরুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

নেপোলিয়ন এ দুজন স্ত্রীলোকের প্রতিই সেণ্ট হেলেনায় থাকাকালীন আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা নেপোলিয়নের গৃহে প্রবেশ করলে নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথার টুপি খুলে সম্মান জানাতেন। তাঁর গভীর আসক্তির কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। ফেনি অপেক্ষা অ্যালবাইনই নেপোলিনের প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন অ্যালবাইন নেপোলিয়নকে বলেই ফেললেন "অনেক আটচল্লিশ বৎসরের পুরুষের দৈহিক ক্ষমতা অল্প বয়সের যুবকের মতই থাকে" একথা বলতে বলতে তাঁরই দু চোখ ছলছল করতে থাকে। অ্যালবাইন নেপোলিয়নকে বুঝাতে চাইছেন নেপোলিয়ন আটচল্লিশ বৎসর বয়সে কেন এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। নেপোলিয়ন উত্তরে অ্যালবাইনকে জানালেন "সত্যিকথা অনেক আটচল্লিশ বৎসরের লোকের যুবাপুরুষের দৈহিক শক্তি বর্তমান থাকে কিন্তু তারা তো নেপোলিয়নের মত এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে না— যা এখন নেপোলিয়নকে করতে হচ্ছে"।

অ্যালবাইন শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেন্ট হেলেনা ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তখন নেপোলিয়নের মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও আনন্দ দান করতে পড়ে থাকলেন একমাত্র বারট্রাণ্ডের পত্নী ফেনি (Fanny)। ফেনির ওপর নেপোলিয়ানের আসক্তি ছিল সত্যি তবে সেটা কামের মোহ নয়। ফেনি তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে নেপোলিয়নের ঘরে যেতেন। নেপোলিয়ন তাঁর ছেলে মেয়েদের সাথে খেলা করতেন। নানান গল্প গুজব করতেন। মনে পেতেন শান্তি। ফেনিকে দেখলে নেপোলিয়নের মনে তাঁর বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখের কথা উদয় হতো।

সেন্ট হেলেনায় থাকাকালীন নেপোলিয়ন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বাইবেলের উপদেশপূর্ণ ছোট ছোট গল্পগুলি তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। এসমস্ত গল্পগুলির সত্যাসত্য যাই থাকুক না কেন এগুলি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে প্রভূত সাহায্য করে। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ আলোচনার জন্য নেপোলিয়ন ইতালীর ধর্ম যাজকের সাহচর্য চাইছিলেন।

২২শে মার্চ ১৮১৮। তিনি বারট্রাণ্ডকে তাঁর মামা কার্ডিন্যাল ফেচের কাছে রোমে চিঠি লিখতে বললেন। নেপোলিয়ন বললেন

বারট্রাণ্ড যেন তাঁর মামাকে লিখে দেন যাতে তাঁর মামা দুজন ইতালীয় অভিজ্ঞ ধর্মযাজক এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে সেণ্ট হেলেনায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নেপোলিয়ন স্থির করলেন হাডসন লো কর্তৃক নিযুক্ত কোন ডাক্তারকে দিয়ে তিনি তাঁর চিকিৎসা করাবেন না।

বারট্রাণ্ড যথারীতি কার্ডিন্যাল ফেচের কাছে চিঠি পাঠালেন নেপোলিয়নের নির্দেশ মত। ১৮১৯ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ চিঠি লেখার দু বৎসর পর কার্ডিন্যাল ফেচ দুজন ক্যাথলিক ধর্ম যাজক পাঠালেন। একজনের নাম ফাদার বোনভিটা, অন্য জনের নাম অ্যাবে ভিগনলি। প্রথম জনের বয়স ৬০ এর উর্দ্ধে, দ্বিতীয় জনের ২৮।২৯। তাঁদের সঙ্গে পাঠালেন এন্টিমার্কি নামক একজন অনভিজ্ঞ ডাক্তারকে। বয়সে তরুণ। রোমের মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ করে সেখানকার এক হাসপাতালে প্যাথোলজি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের সেণ্ট হেলেনায় থাকার ব্যয়ভার বহন করলেন মা লেটিজিয়া। এন্টিমার্কিকে বছরে ৯০০০ ফ্রাঙ্ক করে দিতে হত।

কিন্তু ধর্ম যাজকদ্বয় বা ডাঃ এন্টিমার্কি কেউ নেপোলিয়নের মনের মত হল না। বৃদ্ধ ধর্মযাজকের কথা বোঝা যেত না। আর অ্যাবে ভিগনলির ধর্ম সম্বন্ধে গভীর কোন জ্ঞান ছিল না। নেপোলিয়নের মনোবাসনা পূরণ করার মত জ্ঞান তাঁর মধ্যে মোটেই ছিল না।

১৮১৯ সালের জানুয়ারী মাসে নেপোলিয়ন গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে ব্রিটিশ সরকার নৌবাহিনীর ডঃ স্ট্রোকেকে নেপোলিয়নের চিকিৎসার জন্য সেণ্ট হেলেনায় প্রেরণ করেন। স্ট্রোকে জাতিতে ছিলেন ইংলিশ। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ডাক্তার সুলভ মানসিকতা তাঁর ছিল।

স্ট্রোকে লংউডে এসে নেপোলিয়নের কারাগৃহে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেলেন। স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। সুস্থ মানুষ ও এরকম ঘরে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়তে বাধ্য। এরকম অস্বাস্থ্যকর

পরিবেশে থেকে যে নেপোলিয়ন অল্প দিনের মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করবেন এটা বুঝতে স্ট্রাকের কোন অসুবিধেই হলো না।

স্ট্রোকে বুঝতে পারলেন নেপোলিয়ন লিভারের ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ রোগ সারাতে হলে যে পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রয়োজন সেন্টহেলেনায় তা সম্ভব নয়। বিশেষত লংউডের মত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আর আলোবাতাসহীন কারাগৃহ থেকে নেপোলিয়ন কোন দিনই সুস্থ হতে পারবেন না। সেটা স্ট্রাকে হাডসন লোকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন।

ডঃ স্ট্রাকের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে এবং নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে হাডসন লো স্ট্রাককে নেপোলিয়নের চিকিৎসা করতে নিষেধ করলেন। এমনকি নেপোলিয়নের ঘরে যেতেও স্ট্রাককে তিনি বারণ করলেন। তাঁকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হল।

এরপর প্রায় নয় মাস নেপোলিয়নের চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারকেই নিযুক্ত করা হল না। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুর দিন আগতপ্রায়। এসময় সেন্ট হেলেনায় রোম থেকে এসে উপস্থিত হলেন ডঃ এন্টিমার্কি ও দুজন ধর্মযাজক।

ডঃ এন্টিমার্কি ছিলেন কর্সিকার অধিবাসী। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ। তবুও কেন যে কার্ডিন্যাল ফেচ তাঁকে সেন্ট হেলেনায় পাঠালেন নেপোলিয়ন কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারলেন না। এন্টিমার্কি নেপোলিয়নের অসুখের গুরুত্বটা মোটেয় উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন নেপোলিয়ন গ্যাসট্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সে ভাবেই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। এতে কোন ফল পাওয়া গেল না।

বরঞ্চ এন্টিমার্কির ঔষধে নেপোলিয়নের শরীরে উল্টো ফল হলো। এন্টিমার্কি প্রদত্ত ঔষধ খেয়ে নেপোলিয়ন এতই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তিনি পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় একদিন ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন।

এরপর থেকে নেপোলিয়ন আর কোনদিন এণ্টিমার্কি প্রদত্ত ঔষধ সেবন করেন নি।

হাডসন লো নেপোলিয়ন কারাগৃহে আছেন, না পালিয়ে যাবার মতলব করছেন—এ চিন্তা করে স্বচক্ষে দেখার জন্য নেপোলিয়নের গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। নেপোলিয়ন বারট্রাণ্ড মারফৎ খবর পাঠালেন যে তিনি কিছুতেই হাডসন লোকে তাঁর গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন না। হাডসন লো জোরপূর্বক দরজা ভেঙে তাঁর গৃহে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করলে নেপোলিয়ন স্পষ্ট বলে দিলেন—তা হলে হাডসন লো নেপোলিয়নের গৃহে প্রবেশ করে তাঁর মৃত দেহখানিই দেখতে পাবেন। একথা শুনে হাডসন লো নেপোলিয়নের গৃহে প্রবেশ করার সংকল্প ত্যাগ করেন। সে সময় কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জজ সারটমাস ষ্ট্রেঞ্জ সেণ্ট-হেলেনায় গিয়ে উপস্থিত হন। হাডসন লো বারট্রাণ্ড মারফৎ নেপোলিয়নকে জানালেন তিনি যেন অন্ততঃ তাঁর গৃহে জজ টমাস স্ট্রেঞ্জকে যাবার অনুমতি দেন। নেপোলিয়ন বারট্রাণ্ডকে এবারও দৃঢ়তার সাথে বলে পাঠালেন তাঁর ঘরে হাডসন লোর কোন লোক ঢুকতে পারবে না। তিনি আরও বলে পাঠালেন যে, যে লোক মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেছেন তাঁকে দেখার এত আগ্রহ কেন ?

এর কিছুদিন পর বারট্রাণ্ড পত্নী ফেনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেণ্ট হেলেনা ছেড়ে চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে—তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে এটাই ছিল ফেনির আসল উদ্দেশ্য। ফেনির সেণ্ট হেলেনা ছেড়ে চলে যাবার কথা শুনে নেপোলিয়ন অতীব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ফেনির সাথে গল্পগুজব করে নেপোলিয়ন তাঁর মানসিক অবসাদ অনেকটা দূর করতে পারতেন। নেপোলিয়ন ফেনিকে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত বান্ধবী বলে মনে করতেন। নেপোলিয়ন এখন বুঝতে পারলেন ফেনি তাঁকে ভালবাসেন না।

লংউডের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে নেপোলিয়নের শরীর জীর্ণ-

শীর্ণ। তাঁর আগের সে পৌরুষ আর নেই, নেই তাঁর মেয়েদের সন্তুষ্ট করার মত দৈহিক সামর্থ। তাই ফেনি নেপোলিয়নকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন—এ ধারণা নেপোলিয়নের মনে দৃঢ়বদ্ধ হল।

ফেনি সেণ্ট হেলেনা ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্তে নেপোলিয়ন এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বলে উঠলেন "**This dignified Scion of Dillon family was infact, "a whore, the most degraded of women"**

এভাবে তিনি যখন মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন সে সময় হঠাৎ একদিন খবর পেলেন তাঁর অত্যন্ত আদরের বোন এলিজা ত্রিয়স্তে (Trieste) মারা গেছেন। নেপোলিয়ন এ সংবাদ পেয়ে এতই মর্মাহত হয়ে পড়লেন যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। চলে গেলেন ভেতরের কামরায়। প্রায় তিন চার ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হল। তখন আগষ্ট মাস ১৮২০ সাল। নেপোলিয়ন তখন নিজেই গুরুতর অসুস্থ। কারাবাসকালে এতবড় মর্মান্তিক আঘাত নেপোলিয়ন আর পাননি। তিনি তাঁর সহচর বারট্রাণ্ড ও ডঃ এন্টিমার্কিকে বলে ফেললেন, "হাঁ, এলিজা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সে আমাদের স্বর্গের রাস্তা দেখিয়ে দিল। আমি এ যাবৎ ভেবে আসছিলাম আমাদের পরিবারের কাকেও সহজে আর মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকবেনা। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমার এ ধারণা সত্য নয়। মৃত্যু আমাদের দ্বারে এসে করাঘাত করতে আরম্ভ করেছে। সে এলিজাকে নিয়ে গেছে। এবার আমার পালা। আমি শুনতে পাচ্ছি এলিজা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।" এ সমস্ত কথা বলতে বলতে নেপোলিয়ন আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এল—কিন্তু পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় আবার কাতর হয়ে পড়লেন। কয়েকবার বমি করলেন। ডাক্তার এসে ঔষধ দিলেন। কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন।

১৮২১ সাল। জানুয়ারী মাস। নেপোলিয়নের রোগযন্ত্রণা আবার বেড়ে গেল। পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কালো কালো বমি করতে লাগলেন।

বারট্রাণ্ড হাডসনলোকে নেপোলিয়নের চিকিৎসার জন্ম অন্য একটি ডাক্তার নিযুক্ত করতে বললেন। বারট্রাণ্ড ডাক্তার আর্ণটের কথা বললেন। হাডসন লো বারট্রাণ্ডের কথায় সম্মতি দিলেন। ডঃ আর্ণট নেপোলিয়নকে পরীক্ষা করে বললেন যে তাঁর রোগ বিশেষ গুরুতর নয়। বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য নেপোলিয়নের এই শারীরিক অবনতি ঘটেনি। হাডসন লো আর্ণটের কথা শুনে বলে উঠলেন —নেপোলিয়নের দেহগত রোগের চেয়ে মনের রোগই বেশি।

নেপোলিয়ন তখনো কিন্তু পেটের ব্যথায় কাটা ছাগলের মত ছটফট করছেন। তবুও ডঃ আর্ণট বুঝতে চাইলেন না যে ওটা নেপোলিয়নের পাকস্থলী বা লিভারের প্রদাহের ব্যথা। হাডসন লোর ভয়ে ভীত আর্ণট। নেপোলিয়ন ডঃ আর্ণটকে বার বার বলে যেতে লাগলেন যে তিনি নিশ্চিত জানেন তাঁর লিভারে ক্যানসার হয়েছে। তাঁর পিতা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নেপোলিয়ন এরপর বারট্রাণ্ডকে ডেকে বললেন যে তিনি ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারছেন তিনি বেশিদিন আর এ পৃথিবীতে থাকবেন না। তিনি মৃত্যুভয়ে কাতর নন। তবে তাঁর একমাত্র ভয় মৃত্যুর পর হয়ত তাঁর মৃতদেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবেতে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হবে। এটা তিনি মোটেই চান না। সে চিন্তায় এখন তাঁর মন বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে।

নেপোলিয়নের এরকম শারীরিক অবস্থা অবলোকন করে তাঁর অনুচরবর্গ দুঃখে কাতর। বারট্রাণ্ড ও মনথোলন নেপোলিয়নের শরীরের এরকম অবস্থা দেখে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

২ই এপ্রিল নেপোলিয়নের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি

ঘটল। ডঃ আর্ণট নেপোলিয়নকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। আর্ণট এবার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে নেপোলিয়ন পাকস্থলী কিংবা লিভারের প্রদাহে ভুগছেন। যে কোন সময় এ ব্যাধি তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে।

রাত্রিতে নেপোলিয়নের শরীরে এতই ঘাম হত যে অন্তত ৫/৬ বার তাঁর জামা কাপড় ও বিছানার চাদর পাল্টাবার প্রয়োজন হত। সেজন্য রাতে তাঁর সাথে একজন লোককে সব সময় থাকতে হত। বারট্রাণ্ড এন্টিমার্কিকে অনুরোধ করলেন তিনিও যেন তাঁদের সাথে পালাক্রমে রাত্রিতে নেপোলিয়নের গৃহে থেকে তাঁকে দেখাশুনা করেন। বারট্রাণ্ড, মনথোলন, মার্চেণ্ড (নেপোলিয়নের খানসামা) এঁরাও পালাক্রমে রাত্রিতে নেপোলিয়নের সাথে থাকতেন।

এন্টিমার্কি বারট্রাণ্ডের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। এন্টিমার্কির এরকম মনোভাবের কথা জানতে পেরে নেপোলিয়ন এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বললেন এখন থেকে তিনি এন্টিমার্কির ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চান না। অথচ এন্টিমার্কিকে নেপোলিয়নের চিকিৎসার জন্য ৯০০০ ফ্রাঙ্ক করে দিতে হত। এ ব্যয়ভার বহন করতেন তাঁর মা।

এদিকে নেপোলিয়নের শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা অবগত হয়ে ফেনি সেন্ট হেলেনা ত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে নেপোলিয়নের স্থির বিশ্বাস ফেনি তাঁর সাথে ছলনা করার জন্য এ সমস্ত কথা বলছেন। ফেনিকে তিনি তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

নেপোলিয়নের আরও ধারণা হল এন্টিমার্কির সাথে ফেনির একটা দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কেননা নেপোলিয়ন জানতেন ফেনি তাঁর দৈহিক সম্ভোগের জন্য সব সময় স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষের খোঁজে থাকেন। তাইত নেপোলিয়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বারট্রাণ্ডকে বলেছিলেন যে তিনিই ত তাঁর স্ত্রী ফেনিকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছেন। নেপোলিয়নের মনে এ ধারণা ও বদ্ধমূল হয়েছে যে এন্টিমার্কি ও ফেনি

চান নেপোলিয়ন যেন তাড়াতাড়ি ধরাধাম থেকে বিদায় নেন। তাহলে তাঁরা দুজনে নিজেদের মনোবাসনা পূরণ করার পুরোপুরি সুযোগ পাবেন।

১৮২১, ১৩ই এপ্রিল। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুর দিন সমাগত। সুতরাং তাঁর উইল লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মনথোলন ও বারট্রাণ্ডকে নির্দেশ দিলেন। নেপোলিয়ন বলে চললেন। তিনি বললেন যে মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ যেন সীন নদীর তীরে সমাহিত করা হয়। তাহলে ফরাসী জনগণ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পাবে। ফরাসী জনগণের জন্য তাঁর কি অসীম ভালবাসা ছিল তা তাঁর এ সমস্ত উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়। নেপোলিয়ন বলতেন "Ashes was an echo cf Homer's warriors, he had no thought of being cremated"—Napoleon by Vincent Cronin. P. 542

তিনি জানালেন যে তিনি সব সময় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নিজের চোখের মণি বলে মনে করতেন। গভীর ভালবাসার বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে সকলকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করলেন। নেপোলিয়ন বললেন যে তাঁর পুত্র তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করবে। তাঁর পুত্র তাঁর মতই ফরাসী জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। তারপর নেপোলিয়ন নিজের মহীয়সী মাতৃদেবীর কথা স্মরণ করলেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

তিনি স্ত্রী মেরিয়ালুাইসাকেও ক্ষমা করলেন। তাঁর চারিত্রিক ভ্রষ্টতাকে তিনি বড় করে দেখলেন না। যে সমস্ত সেনানায়ক ১৮১৪—১৮১৫ সালে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—তাঁদেরও তিনি ক্ষমা করলেন।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে তাঁর প্রায় ৭$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক্ (ফরাসী মুদ্রা) সঞ্চিত ছিল। সে অর্থ তিনি মনথোলন, বারট্রাণ্ড, মার্চেণ্ড ও তাঁর

অন্যান্য অনুচর ও সাথীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তবে সব চেয়ে বেশি অর্থ দান করলেন মনথোলনকে।

তাঁর কর্সিকার সমস্ত সম্পত্তি দান করলেন তাঁর শিশুপুত্রকে (অর্থাৎ ল্যুইসার পুত্রকে)। তাঁর রণ-সাজ, তরবারি প্রভৃতিও তাঁর পুত্রকে দান করলেন। তাঁর খানসামা মার্চেণ্ডকে দান করে গেলেন তাঁর মাথার মসৃণ চুল।

নেপোলিয়ন ভগবান এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর তিনি ক্যাথলিক ধর্মেই বিশ্বাস করতেন। এবং ক্যাথলিক ধর্মমতে যাতে তার মৃতদেহ সমাহিত করা হয় তাও তিনি বলে গেলেন।

লংউডের কারাগৃহে তিনি গভীর ভাবে তাঁর মাকে স্মরণ করতেন। তিনি মনথোলন এবং বারট্রাণ্ডকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলতেন যে তাঁর মা তাঁকে এতই ভালবাসেন যে তিনি তাঁর শেষ বস্ত্র খানিও তাঁর জন্য দান করতে পারেন।

হায় হতভাগিনী লেটিজিয়া। তিনি তখন রোমে অবস্থান করছেন। আর পুত্রের দুর্দশার কথা শ্রবণ করে অঝোরে কাঁদতেন। অবশ্য সে কান্না ব্রিটিশ রাজ বা তাঁদের প্রতিভূ হাডসন লোকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি।

নেপোলিয়ন তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে মনথোলনকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, তিনি যেন তাঁর কথামত একটি চিটি লিখে রাখেন এবং তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর তা যেন হাডসন লোর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। "The Emperor Napoleon breathed his last on the·········after a long and painful illness. I have the horour to communicate tl is intelligence to you. The Emperor has authorised me to communicate to you, if such be your desire, his last wishes···········"—Vincent Cronin.

নেপোলিয়ন নিজেই নিজের রোগ সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলেন সেটাই সত্যে পরিণত হল। তিনি সত্যি পাকস্থলীর ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবং এ রোগের যে কি অসহনীয় কষ্ট তা ভুক্তভোগী লোক ভিন্ন কেউ অনুধাবন করতে পারবে না। অনেকের ধারণা নেপোলিয়নকে Slow poison করে তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশরাজ। কেন না অনেকদিন আগে খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল গবেষণা করে নাকি দেখা গেছে নেপোলিয়নের চুলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কিন্তু একথার সত্যতা সম্বন্ধে আজ অবধি আমি কোন বইতে উল্লেখ দেখিনি। এমন কি ১৯১৯ সালে ভিনসেণ্ট ক্রোনিনের লেখা নেপোলিয়ন গ্রন্থে ও এর কোন উল্লেখ নেই।

তাঁর জীবনী লেখক এবট, ক্রোনিন, লুড্উইগ বা জন রবার্ট শীলে সকলেই একমত যে নেপোলিয়ন তাঁর পিতার মত পাকস্থলীতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে তাঁর ওপর সেণ্ট হেলেনার লংউডের কারাগৃহে ব্রিটিশরাজের প্রতিভূ হাডসন লো যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন তাতেই তাঁর পরমায়ু ৫২ বৎসরে শেষ হয়ে গেল। অন্য কোথাও থাকলে হয়ত এত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটত না। সুচিকিৎসায় ও নির্মল পরিবেশে তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন। তিনি নিজেই বলে গেছেন তাঁর ৮০ বৎসরের পরমায়ু ব্রিটিশরাজের প্রতিভূ হাডসন লো ৫২ বৎসরে শেষ করেদিলেন। "I die prematurely, assassinated by the english oligarchy and its higher killer ; the English Nation will not be slow in averging me"—Napoleon.

রোগযন্ত্রণা ও হাডসন লোর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অন্য কেউ হলে হয়ত, আত্মহত্যার পথই বেছে নিতেন। কিন্তু নেপোলিয়নের যেমন মানসিক দৃঢ়তা ছিল, তেমনি ছিল তাঁর অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা। তা না হলে তিনি আত্মহত্যা করে অনেক

আগেই নিজের জীবনের যবনিকা টানতে পারতেন। ছয় বৎসর তিল তিল করে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তাঁকে এভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হত না।

লংউডে নেপোলিয়নের শরীরের ওজন প্রায় অর্ধেকের বেশি কমে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এ চেহারা চোখে দেখা যায় না।

যতই মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছিল ততই তিনি সূর্যের আলোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। তিনি সব সময় দিনে তাঁর ঘরের জানালা খোলা রাখতে বলতেন যাতে অন্তত সূর্যের খানিকটা আলোর ছটা তাঁর ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়।

২৬শে এপ্রিল মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন আগে তিনি যোসেফাইনকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তখন রাত গভীর। নেপোলিয়ন হঠাৎ মনথোলনকে চিৎকার করে ডাকলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন না। মনথোলন এসে শয্যাপাশে বসলেন। নেপোলিয়ন অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে যেতে লাগলেন। মনথোলন মনোযোগ সহকারে তাঁর সমস্ত কথা শুনলেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নেপোলিয়ন বলে চলেছেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী যোসেফাইন এই মাত্র তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁর কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন চুপচাপ। কিন্তু তাঁকে যোসেফাইন আলিঙ্গন করলেন না। নেপোলিয়ন তখন তাঁকে তাঁর বাহুডোরে আবদ্ধ করতে যাবেন সে সময় যোসেফাইন অন্তর্হিত হলেন।

নেপোলিয়ন বলে চললেন যে তিনি যোসেফাইনকে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ও দেখেছিলেন। যোসেফাইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন তিনি দেখতে পাননি। যোসেফাইন যেন কাকে বলে গেলেন শীঘ্রই তাঁরা আবার মিলিত হবেন এবং তাঁদের মধ্যে আর কখনো বিচ্ছেদ ঘটবেনা। নেপোলিয়ন মনথোলনকে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন

তিনি কি যোসেফাইনকে এই অবস্থায় দেখেছেন ?

এ সমস্ত কথা বলতে বলতে নেপোলিয়ন আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। নির্বাসিত জীবনে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থেকেও নেপোলিয়ন যোসেফাইনকে স্বপনে জাগরণে দেখতে পেতেন। কি অসহনীয় দুঃখ তাঁর হৃদয়ে ? শারীরিক ও মানসিক আঘাতে আঘাতে তিনি লংউডের কারাগৃহে জর্জরিত।

২৭ শে ২৮ শে এপ্রিল নেপোলিয়নের জীবনের অন্তিম অবস্থা। কালো কালো বমি করছেন। যা খাচ্ছেন তাই বমি করে দিচ্ছেন। তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শরীরে ঘামের পর ঘাম হচ্ছে। সর্বাঙ্গঃযেন বরফ হয়ে গেছে। ডাক্তার বা অন্য কেউ কিছু বলছেন কিনা সেটাও তাঁর কানে আসছে না। তিনি যেন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললেন।

২৯ শে এপ্রিল একটু জ্ঞান ফিরে এলে ডাক্তার তাঁকে কমলা-লেবুর রস পান করতে দিলেন। কফি খেতে বারণ করলেন। কফি ছিল নেপোলিয়নের অতীব প্রিয়। কিন্তু ডাক্তারের আদেশ অমান্য করে কফি খাবার সাহস তাঁর হল না। শুধু তিনি বারট্রাণ্ডকে জিজ্ঞেস করলেন কফি বা লেবুর রস কোন্‌টা খাওয়া তাঁরপক্ষে এ অবস্থায় যুক্তিযুক্ত।

নেপোলিয়নের কথায় বারট্রাণ্ডের দুচোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ল। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন একদা অর্ধেক ধরণীর অধীশ্বর যে 'নেপোলিয়নের নির্দেশে সকলেই থরহরি কম্পমান হতো, যাঁর নির্দেশে ফরাসী সৈন্য মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত সে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন আজ অনাথ শিশুর ন্যায় পরের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। মানুষের অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে নেপোলিয়নের জীবন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে নেপোলিয়ন ভয়ানক অদৃষ্টবাদী

ছিলেন। তিনি বলতেন "মুখ মানুষকে প্রতারণা করতে পারে কিন্তু হাত তা কখনো করে না," হাতে যা লেখা আছে তা ঘটতে বাধ্য। এ ব্যাপারে নেপোলিয়নের জীবনে একটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছর আগের ঘটনা নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর সাধারণ একজন অফিসার। তিনি একদিন এক নাম করা জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ্ বৃদ্ধ ধর্মযাজকের কাছে তাঁর করকোষ্ঠী বিচার করার জন্য গিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ ধর্মযাজক তাঁকে তাঁর করকোষ্ঠী বিচার করে যা যা বলেছিলেন তার প্রায় সবই মিলে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। তাই তিনি সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধ যাজককে খুঁজে বের করে ভার্সাইয়ের কাছে ওয়াল পার্কে তাঁর জন্য একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করে দিয়েছিলেন। এবং তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য বাৎসরিক মোটা অঙ্কের পেনসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ধর্মযাজকের জীবনের শেষটা যেমনই শোকাবহ তেমনই করুণ। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৃদ্ধ ধর্মযাজক নেপোলিয়নের একটি কোষ্ঠী তৈরী করে বিচার করে দেখলেন। তিনি উক্ত বৎসরে জুন মাসে নেপোলিয়নের পতনের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে।

তাই এ সংবাদটি দিয়ে তিনি সম্রাটকে সতর্ক করে দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ১৮১৫ সালের ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহের দিনগুলিতে তিনি পায়ে হেঁটে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে অনুসরণ করলেন। ওয়াটারলুর যুদ্ধের আগের দিন ১৮১৫ সালের ১৪ই জুন তিনি প্রায় নেপোলিয়নের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের রক্ষীবাহিনী তাঁকে সম্রাটের কাছে যেতে অনুমতি দিল না। তাঁকে তারা পাগল বলে তাড়িয়ে দিল। নেপোলিয়নকে তিনি আর তাঁর কথা জানানোর সুযোগ পেলেন না।

নেপোলিয়ন ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্যারিসে পালিয়ে যাবার কয়েকদিন পরে বৃদ্ধ ধর্মযাজকের মৃতদেহ রণক্ষেত্রের সন্নিকটে এক গর্তের মধ্যে পাওয়া যায়। মৃত অবস্থায় বৃদ্ধ ধর্মযাজক তাঁর মনিব সম্রাট নেপোলিয়নের কোষ্ঠী বিচার করা কাগজটি তখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন।

নেপোলিয়নের মৃত্যুর দিন সমাগত। তেসরা মে ডাক্তার নেপোলিয়নের জীবনের সব আশা ত্যাগ করলেন। নেপোলিয়ন তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভুল বকতে আরম্ভ করেছেন। বাইবেলের বাণী তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সুযোগ কোথায়? তবুও ধর্মযাজক অ্যাবে ভিগনলি ঈশ্বরের সে প্রার্থনা মন্ত্র তাঁর কানের কাছে উচ্চারণ করতে লাগলেন। "Deliver Lord, the Soul of your Servant, as You delivered mosses from the hands of pharoah, King of the Egyptians, deliver Lord; the Soul of your Servants as you delivered St. Peter and St. Paul from prison."

৪ঠা মে লংউডে প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হল সারাদিন ঝড়ের বেগে নেপোলিয়নের কারাগৃহ যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম। সেই সময় নেপোলিয়নের শরীরের ওপরও যেন ঝড়ের প্রলয় নাচন আরম্ভ হয়ে গেছে। তাঁর সমস্ত বুকে কফের ঘর্ ঘর্ শব্দ। তিনি ভুল বকে চলেছেন। দু একবার মনথোলনকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছেলের নাম কি? মনথোলন নাম বলে দিলেন। এভাবে ৪ঠা মে-র সারারাত কাটল।

৫ই মে সকাল থেকেই তিনি সংজ্ঞাহীন। শুধু সময় সময় অস্পষ্ট স্বরে বলে যাচ্ছেন। "ফরাসী ভূমি, সৈন্য মণ্ডলী, যোসেফাইন"। এভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল ৫-৪৯ মিঃ পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে তিনি পরপারে চলে গেলেন।

ডঃ এণ্টিমাকি তাঁর চোখ বুঝে ভগবানের কাছে নেপোলিয়নের

অমর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। শেষ বিদায় জানিয়ে এন্টিমার্কি, মনথোলন, বারট্রাণ্ড, ফেনি ও উপস্থিত অন্যান্য সকলে সম্রাটকে সেল্যুট করলেন। এন্টিমার্কি সম্রাটকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

মনথোলন সম্রাটের নির্দেশমত মৃত্যুর সপ্তাহ খানিক আগে নেপোলিয়নের উক্তি সম্বলিত কাগজটি হাডসন লোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাডসন লো লংউডে এসে নেপোলিয়নের ঘরে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘ চার বৎসর যাবৎ শত চেষ্টা করেও তিনি নেপোলিয়নের কাছ থেকে তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি পাননি। আজ দীর্ঘ চার বৎসর পর চিরনিদ্রায় শায়িত সম্রাটের মৃতদেহ সন্দর্শনের সুযোগ ঘটল হাডসন লোর।

নেপোলিয়ন মৃত্যুর অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন যেন মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ ব্যবচ্ছেদ এর ব্যবস্থা করে তাঁর আসল রোগটা নির্ণয় করা হয়। তিনি যদি সত্যি পাকস্থলীতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তা হলে এ রোগ যাতে তাঁর ছেলের মধ্যে সংক্রামিত না হয় তার ব্যবস্থা করতে সব হিতাকাঙ্খীর কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন।

নেপোলিয়নের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে এন্টিমার্কি দেখলেন নেপোলিয়ন তাঁর পিতার মত পাকস্থলীতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। "...a very extended cancerous ulcer occupied particularly the upper part of the internal Surface of the Stomach......without a doubt Napoleon had died of the cancer of the Stomach"—Napoleon by Vincent Cronin—P. 548. নেপোলিয়নের শবদেহ ব্যবচ্ছেদের সময় পাঁচজন ইংরেজ সার্জেন, তিন জন ইংলিশ সামরিক অফিসার এবং তিনজন ফরাসী জেনারেল টেবিলের সামনে উপস্থিত ছিলেন।

নেপোলিয়নের মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লংউডে নেপোলিয়নের কারাগৃহে পাহারা দেবার জন্য যে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল তাঁরা এবং তাদের অফিসাররা ইংলিশ নৌবাহিনীর সেনানায়ক মণ্ডলী সব দলে দলে স্বেচ্ছায় লংউডের কারাগৃহে আসতে লাগলেন নেপোলিয়নকে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। একে একে এলেন নেপোলিয়নের সহচরবৃন্দ যাঁরা ফ্রান্স থেকে তাঁর সাথে এরকম বন্দীজীবন যাপন করতে সেণ্ট হেলেনায় এসেছিলেন।

নেপোলিয়নের মৃতদেহ রাখা হয়েছিল তাঁর কারাগৃহের বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর। সেনানায়কের পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। বীর শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের মুখ মণ্ডল থেকে যেন তখনো জ্যোতি বের হচ্ছে। ইংলিশ সেনানায়ক মণ্ডলীর পরনে ছিল সাদা পোষাক। হাতে ছিল না তাঁদের কোন অস্ত্রশস্ত্র।

নেপোলিয়নের মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁরা নেপোলিয়নকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কোন কোন ইংলিশ সেনানায়ক নেপোলিয়নের পায়ে চুম্বন করে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা জানালেন নেপোলিয়নের মরদেহের প্রতি। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে নেপোলিয়নের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি অপূর্ব সৌম্য শান্তমুখ মণ্ডল।

যেন স্বর্গের কোন এক দেবদূত চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। নেপোলিয়নের শেষ ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ যেন ফ্রান্সের সীন নদীর ধারে সমাহিত করা হয়। যাতে তাঁর প্রাণের চেয়ে ও অধিক ফরাসী জনগণ, সৈন্য মণ্ডলী তাঁর মরদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পায়।

কিন্তু ব্রিটিশরাজ তাঁর ইচ্ছে পূরণে সম্মতি দেন নি। তাই তাঁর মরদেহকে লংউডে তাঁর কারাগৃহের কিছু দূরে এক সুন্দর জায়গায় সমাহিত করা হয়। জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভা ছিল

অপূর্ব। উইলো গাছে ভরা এ সুন্দর জায়গাটিতে নেপোলিয়ন দু একবার এসে ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তি পেয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। এ জায়গাটিকে 'টরবেট স্প্রীং' (Torbett Spring) নামে অভিহিত করা হতো।

মেহগিনি কাঠের তৈরী শবাধারে তাঁর মরদেহ রাখা হল। শবাধারটি একটি শকটে তোলা হল। চারটি ঘোড়ায় ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল শকটটি, শকটের পেছনে ছিল নেপোলিয়ন যে ঘোড়ায় আরোহণ করে লংউডে সময় সময় ভ্রমণে বের হতেন সেই ঘোড়াটি।

রাস্তার দুধারে ইংরেজ সৈনিকরা তাদের বন্দুক নিম্নমুখী করে নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধা জানাতে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাদের বাদ্যযন্ত্রে করুণ সুর বাজাতে বাজাতে সামরিক কায়দায় চলছিল শকটের পেছন পেছন। দিনটি ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। সূর্যের অপূর্ব আলোরছটা উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছিল নেপোলিয়নের শবাধারের ওপর।

সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় নেপোলিয়নের মরদেহ সমাহিত করার ব্যবস্থা করলেন ব্রিটিশরাজের প্রতিভূ সেন্ট হেলেনার অত্যাচারী গভর্ণর হাডসন লো। যাঁর অত্যাচারে নেপোলিয়ন বিগত ছয় বৎসর ধরে লংউডের কারাগৃহে বন্দী দশায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন; সেই হাডসন লো আজ মৃত্যুর পর নেপোলিয়নের মরদেহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সামরিক কায়দায় সমাহিত করার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। এ যেন অত্যাচারী নরপশু হাডসন লোর নেপোলিয়নের প্রতি লোক দেখনো সমবেদনা জ্ঞাপন। এটা সমগ্র বিশ্বের চোখে তাঁর অত্যাচারের কাহিনীকে চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস ভিন্ন আর কিছু বলা যায় কিনা আমার জানা নেই।

৯ই মে সকাল ১০টায় নেপোলিয়নের মরদেহ 'টরবেট স্প্রীং' নামক স্থানে নিয়ে আসা হল। সেখানে দুটি উইলো গাছের মাঝখানে

ফাঁকা জায়গায় নেপোলিয়নের মরদেহ সমাহিত করার জন্য সমাধিক্ষেত্র তৈরী করে রাখা হয়েছিল।

ক্যাথলিক ধর্মযাজক অ্যাবে ভিগনলি শেষবারের মত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বারট্রাণ্ড শবাধার থেকে নেপোলিয়নের তরবারিটি সরিয়ে নিলেন।

হাডসন লো বারট্রাণ্ডকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি সম্রাট নেপোলিয়নকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর কোন বক্তব্য রাখতে চান কিনা? বারট্রাণ্ডের তাঁর কথার উত্তর দেবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। সম্রাটকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কেউ কোন বক্তব্য রাখলেন না।

ধীরে ধীরে শবাধারটি শকট থেকে নামানো হল। উপস্থিত ইংরেজ সামরিক বাহিনীর লোকেরা সামরিক কায়দায় তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাল নেপোলিয়নের অমর আত্মার প্রতি। নেপোলিয়নের এতদিনের সেণ্ট হেলেনায় সুখ দুঃখের অনুচর ও সহচর বৃন্দ নেপোলিয়নের অমর আত্মার প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করল। নেপোলিয়নের মরদেহ শায়িত করা হল উইলো গাছের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় তাঁর জন্য তৈরী সমাধিক্ষেত্রে। কিন্তু সমাধিক্ষেত্রে নেপোলিয়নের নামাঙ্কিত কোন সমাধি ফলকের ব্যবস্থা করা হল না।

এত যুদ্ধের বীর নায়ক নেপোলিয়নের জীবনের এরকম অন্তিম পরিণতিতে এমন কোন পাষাণ হৃদয় নেই যার মনে করুণার সঞ্চার হয়নি। নেপোলিয়ন বিশ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করেছিলেন ঠিক কিন্তু তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য। তাই তিনি মৃত্যুর কিছু আগে রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় জেনারেল মনথোলনকে বলেছিলেন যে তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ চাননি, চেয়েছিলেন সমগ্র ইয়োরোপের নিষ্পেষিত রাষ্ট্রের জনগণকে অত্যাচারী সম্রাটদের হাত থেকে মুক্ত করে ইয়োরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সে সুযোগ ইয়োরোপের অত্যাচারী রাজ-

শক্তিবর্গ তাঁকে দেননি। কর্সিকার উন্নতি বিধানের জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করে রেখেছিলেন তাও তিনি মনথোলনকে বলেছিলেন। নেপোলিয়নের ভাষায় বলি "আমার শত্রুগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখে আমার এই সকল অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি চির শান্তির উপাসক ছিলেন, এরা তাঁকে যুদ্ধের দানবে পরিণত করেছে। চাতুরীদ্বারা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিকে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে, সকলেই এককালে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে আমাকে পরাস্ত করেছে।" তিনি আরও বলে গেলেন "আমার একনায়কত্ব সে সময় দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার প্রমাণ এই যে আমি যেরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা আমার দেশবাসী আমার ওপর অর্পণ করেছিল। অতএব দেশের স্বার্থেই, দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আমি একনায়ক হিসেবে আমার কাজ চালিয়ে গিয়েছি।"

নেপোলিয়ন মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তাঁর সহচরদের লংউডের কারাগৃহে বলে গেলেন যে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনি বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন না। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন এজন্য যে ফরাসী বিপ্লবের ঘোর অরাজকতার পর তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের মূল বাণীকে (স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী) তিনি সমগ্র ইয়োরোপে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টার কসুর করেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করলেন বংশ গৌরবে নয়, মানুষের গুণ কৌলীণ্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারে। আমরা আইনের চোখে সকলেই সমান। সেখানে উঁচু নিচু কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর শাসনকালে ফ্রান্সে অপরাধ মূলক কার্যকলাপ অনেক কমে গিয়েছিল। তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ সম্বলিত প্রায় যাট হাজার চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিগুলির গুরুত্ব বিশ্বের সকল রাজনীতিবিদদের কাছে অপরিসীম। তিনি চেয়েছিলেন

সমগ্র ইয়োরোপে এক আইন প্রবর্তন করতে। একই ন্যায় নীতির ভিত্তিতে ইয়োরোপীয় দেশগুলিকে পরিচালিত করতে। স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সমগ্র ইয়োরোপে একটি লীগ অব ন্যাশেনস। তিনি বলতেন "I wanted to found a European System a Europen Code of law, a European code of appeal, there would have been but one People throughout Europe"—Napolean by Emil Ludwig. তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র ইয়োরোপে শান্তি স্থাপন করতে—কিন্তু তঁার অনেক ইচ্ছেই অপূরণ থেকে গেল।

মৃত্যুর পূর্বে নেপোলিয়ন নিদ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে তাঁর পতনের মূল কারণ তিনি নিজেই। তিনি নিজেই নিজের শত্রু "No one but myself can be blamed for my fall. I have been my own greatest enemy, the cause of own disastrous fate" তঁার পতনের জন্য তিনি ভগবানকে দায়ী করেন নি, দায়ী করেছেন নিজেকে। তিনি বলেছেন অদৃষ্টের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন তাঁর পতনের মূল কারণ। লংউডের কারাগৃহে বসে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি এ সমস্ত কথা বলে যেতেন। "নেপোলিয়নই একমাত্র নেপোলিয়নের পতন ঘটাতে পারে"—"Napoleon alone could overthrow Napoleon"।

তিনি বলতেন, "আমি যখন চোখ বুজে থাকি তখন আমার ভুল ভ্রান্তিগুলি আমার চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মত ভেসে ওঠে। আমি আমার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিছু পেতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ধনুকটিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাঁধতে চেয়েছিলাম এবং আমি আমার সৌভাগ্যদেবীর ওপর অত্যাধিক বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। যার পরিণতিতে আমার পতন ঘটল।

"অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফ্রান্সিসের কন্যাকে বিয়ে করে আমি আমার শক্তি বাড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রান্সিস হচ্ছেন একজন মোটা মাথার

লোক—যিনি অষ্ট্রীয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাটারনিকের হাতের ক্রীড়নক ভিন্ন আর কিছুই নন। তাই তিনি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের কাছ থেকে সাহায্য ত পাননি পেয়েছেন বিরোধিতা। যা তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।"

তিনি বলেছেন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারলে তিনি সমগ্র ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন কিন্তু তাঁর ভুল পদক্ষেপের ফলে তা সম্ভব হল না। "If I had remained victorious over Russia in 1812, the problem of peace would have been solved for a hundred years to come" -Napoleon by Emil Ludwig.

নেপোলিয়নের এ রকম শোচনীয় মৃত্যুতে বিশ্বের যে সমস্ত মনীষী শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত জার্মান মনীষী গেটে অন্যতম। গেটে ছিলেন জার্মানীর অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক বিজ্ঞান সাধক। এক কথায় তিনি ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী।

গেটে নেপোলিয়ন অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় ছিলেন। গেটের জন্ম ১৭৪৯ সালে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে আর নেপোলিয়নের ১৭৬৯ সালে কার্সিকাদ্বীপে। গেটে যখন ক্রিস্তিয়ানাকে নিয়ে সুখে সংসার পেতে জার্মানীর ভাইমারে অবস্থান করছেন তখন ফ্রান্সে দেখা দিল বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের লেলিহান বহ্নিশিখা গেটেকে বিচলিত করে তুলেছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গেটের প্রথম পুত্র (ক্রিস্তিয়ানার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করে। গেটে ফরাসী বিপ্লবের রক্তপাতকে সহ্য করতে পারেননি। তিনি তখন ভাইমারে কৃষি মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত। গেটে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে মসিধারণ করলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ন এসে ফ্রান্সে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। বিপ্লবের ইন্ধন অনেকটা প্রশমিত হল। নেপোলিয়নই ফ্রান্সে শান্তি

শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, নেপোলিয়নের সমরকুশলতা, শিল্প সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে তাঁর সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সমগ্র ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণীকে পরিব্যাপ্ত করার প্রচেষ্টা—এসব কিছু গেটেকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল।

গেটে বলতেন নেপোলিয়ন অজেয়। নেপোলিয়নকে তিনি সেন্ট জন দি ডিভাইনের সাথে তুলনা করেছেন। গেটে মনে করতেন তাঁকে পরাজিত করার ক্ষমতা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কারও নেই। লীপজীগের যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে নেপোলিয়নের পরাজয় সেখান থেকে ৫০ মাইল দূরে ভাইমারে গেটের কাছে গিয়ে পৌঁছলে গেটে তা বিশ্বাস করতে চানান। এখবরে গেটেকে যে কতখানি আহত করেছিল তা তাঁর কবিতার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। গেটের কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল —

"He who feels courage in his royal
breast
Knows no sudderings, treads gladly
The underlined road leading to the
steps of the throne
Knows the danger and never the less
mounts confidently.
....
To every man, be he whom he may
There comes a last happiness and a
last day."

একই দিনে বিখ্যাত জার্মান চিন্তাবিদ্ শিলিং (Schelling) লিখলেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না নেপোলিয়নের পতন আসন্ন। তিনি নিশ্চিত নেপোলিয়নের সেনাপতিরা তাঁর বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, তিনি নিশ্চয় সব কাটিয়ে উঠে আবার বিজয় গৌরবে সমহিমায় সমাসীন হবেন। কিন্তু শিলিং এর আশা দুরাশায় পর্যবসিত হল।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলকে নেপোলিয়নের পতনের খবর বিরাট মানসিক আঘাত দিয়েছিল। হেগেল লিখলেন নুরেনবার্গের জনসাধারণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানিয়ে যে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা মেলেনা। এ সমস্ত শহরের ভদ্রজনমণ্ডলীর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এরকম চিন্তাধারা অত্যন্ত ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনজন জার্মান মনীষীই সমভাবে নেপোলিয়নের পতনে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন।

জেনার যুদ্ধে জয়লাভের পর নেপোলিয়ন এরফার্টে অবস্থান করছেন। ১৮০৮ সাল। নেপোলিয়ন গেটেকে এরফার্টে আমন্ত্রণ জানালেন। একদিন নেপোলিয়ন প্রাতঃরাশ সারছেন। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন গেটে। শান্ত, সৌম্য কান্তি পুরুষ। নেপোলিয়ন বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন এরকম দেবোপম চেহারা তিনি ইতিপূর্বে আর কারও মধ্যে দেখেন নি। গেটের সঙ্গে নেপোলিয়ন প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করলেন। নেপোলিয়ন গেটেকে প্যারিসে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন।

গেটেও নেপোলিয়নের সাথে আলাপ করে সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নেপোলিয়নকে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করে ক্ষান্ত হলেন না, নেপোলিয়ানকে তিনি জার্মানীর হিতাকাঙ্খী বলেও উল্লেখ করলেন।

গেটে ছিলেন মননশীলতার প্রতীক। জার্মানী যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসিহস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত সে সময় কিন্তু গেটে তাঁর পুত্রকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি দেননি। এজন্য তিনি নিজের দেশে সমালোচিতও হয়েছেন। তবে গেটে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপে জার্মানীর শ্রীবৃদ্ধি হতে বাধ্য।

নেপোলিয়নই জার্মানীর ঐক্য বন্ধনের পথ প্রশস্ত করে

দিয়েছিলেন। ৩৩৯টি ডাচিকে তিনি মাত্র ৩৯টি ডাচিতে পরিণত করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে বিসমার্ককে জার্মানীর ঐক্য-বন্ধনের সহজ সুযোগ করে দিয়েছিল। তা না হলে বিসমার্কের পক্ষে জার্মানীর ঐক্য বন্ধন এত সহজে সম্পন্ন করা কোন মতেই সম্ভব হতো না। ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য বন্ধনের পেছনে নেপোলিয়নের অনবদ্য অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। গেটে, শেলিং ও হেগেলের মত জার্মান মনীষীরা সেকথা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

এ সময়ে নেপোলিয়নের অনেক সহচর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর ভাইরা করেছেন তাঁকে প্রতারণা। ভগ্নিপতি ক্যারোলিনের স্বামী মুরাটও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ইংলণ্ডের সাথে হাত মিলালেন। মা লেটিজিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে ও জামাইদের এরূপ আচরণে হতাশায় দুঃখে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। লংউডের কারাগৃহে বসে বসে নেপোলিয়ন এগুলি মনথোলন, বারট্রাণ্ড, মার্চেণ্ড এঁদের বলে যেতেন। আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ত।

লংউডের কারাগৃহে নেপোলিয়নের এরূপ শোচনীয় মৃত্যু, ব্রিটিশ-রাজের তাঁর ওপর এরকম অত্যাচার, ঘাতক হাডসন লোর বর্বর আচরণ, সর্বোপরি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসেলরীর গোপন নির্দেশের কথা জানতে পেরে ইংলণ্ডের অনেক মনীষীই—ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাউস অব পীয়ারসের ডিউক অব সাসেক্স এবং লর্ড হল্যাণ্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। লেডী হল্যাণ্ড ত নেপোলিয়নের কাছে নিয়মিত বইপত্র ও ফল ইত্যাদি ইংলণ্ড থেকে প্রেরণ করতেন লংউডে।

একজন প্রখ্যাত ইংরেজ আইনজীবী স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনের ধারা উদ্ধৃত করে ২৩টি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করে দিলেন যে, ওয়াটারলুর যুদ্ধে

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তখন তাঁর ওপর এরকম বর্বর আচরণ আইনের চক্ষে অমার্জনীয়, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অপরাধ। প্রখ্যাত কবি টমাস মুর ও লর্ড বায়রণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

নেপোলিয়নের ওপর এরূপ বর্বরোচিত আচরণে ঘাতক হাডসন লোর মেয়ে পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। হাডসন লোর মেয়ে গোপনে নেপোলিয়নের সাথে অনেকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। নেপোলিয়ন লংউডে তাঁর কারাগার সংলগ্ন যে বাগানটি তৈরি করেছিলেন হাডসন লোর মেয়ে সেখানে প্রায় যেতেন। নেপোলিয়নের ওপর তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তাঁর আচার আচরণে তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেতো। কিন্তু ঘাতক হাডসন লোর ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করার সাহস পেতেন না। হাডসন লোর মেয়েটি সত্যি নেপোলিয়নকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা বিশ্বজনীন এর স্বাভাবিক গতিরোধ করার ক্ষমতা বিশ্বের কারও নেই—এমন কি ঘাতক হাডসন লোরও নেই।

নেপোলিয়ন শেষ দিকে তাঁর বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর সাথে যাঁরা ফ্রান্স থেকে এসে গত ছয় বৎসর ধরে লংউডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন তাঁদের মনোবেদনার কথা। নির্বাসিত জীবনের দুঃখ দুর্দশায় তাঁরাও যে ভেঙ্গে পড়েছিলেন নেপোলিয়নের তা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। তাই মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেই তাঁদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলে গেলেন, "আমি যখন থাকবো না মৃত্যু এসে যখন আমায় নিয়ে যাবে, তোমরা তখন আনন্দে তোমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলিত হবার জন্য দেশে ফিরে যাবে। তাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরা আবার সুখে দিন যাপন করবে। আর আমি পরপারে গিয়ে মিলিত হব আমার বীর সেনানায়ক ও সৈন্য মণ্ডলীর সাথে—যেখানে তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে যেমন—ক্লেবার, বেসিয়াস, ড্যুরো, নে, মুরাট,

মাসেনা, বার্থিয়ার প্রভৃতি। তাঁরা সকলেই আমার কাছে এসে ভিড় করবে। আমরা আবার একত্রে মিলিত হয়ে আমাদের সেই পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করব। আমি তাদের কাছে আমার শেষ জীবনের অন্তিম পরিণতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার সুযোগ পাব। আমাকে পেলে তারা তাদের হৃত গৌরবের কাহিনীতে আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। আমরা আমাদের যুদ্ধের কথা সিপিও এবং হ্যানিবলের কাছেও বলবো। বলবো সীজার ও ফ্রেডারিকের কাছে কি করুণ তাঁর স্বগতোক্তি।"

নেপোলিয়ন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর সমাধিক্ষেত্র পাহারা দেবার জন্য একজন প্রহরীর ব্যবস্থা করলেন। মৃত্যুর পর এভাবে ব্রিটিশ রাজ নেপোলিয়নের মরদেহের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা দেখালেন। ১৯ বৎসর ধরে পালাক্রমে পাহারা দিয়ে গেছে ইংরেজ কর্তৃক নিযুক্ত প্রহরী নেপোলিয়নের সমাধিক্ষেত্র। অবশ্য এ সমাধিক্ষেত্রে নেপোলিয়নের নামাঙ্কিত কোন সমাধি সৌধ বা স্মৃতি সৌধ স্থাপন করা হয়নি—মূলত হাডসন লোর একগুঁয়েমির জন্য। কেন না হাডসন লো চেয়েছিলেন ওখানে কোন স্মৃতি সৌধ, নির্মাণ করলে তাতে নামাঙ্কিত থাকবে "নেপোলিয়ন বোনাপার্ট" কথাটি কিন্তু বারট্রাণ্ড তাতে সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন সে স্মৃতি সৌধে লিখে দিতে হবে "সম্রাট নেপোলিয়নের স্মৃতি সৌধ," হাডসন লো এতে সম্মতি দেন নি। হাডসন লো নেপোলিয়নকে সম্রাট বলে উল্লেখ করতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়—জেনারেল বারট্রাণ্ডের সাথে তাঁর ঘোরতর মানসিক সংঘাত উপস্থিত হয়। ফলে নেপোলিয়নের সমাধিক্ষেত্রে কোন স্মৃতি সৌধ—নেপোলিয়নের নামাঙ্কিত করে তৈরী করা হয়নি। অবশ্য ১৯ বৎসর পর নেপোলিয়নের ভৌতিক দেহাবশেষ প্যারিসে নিয়ে আসা হল। ফ্রান্সের সীন নদীর তীরে এ দেহাবশেষ শায়িত করে তার ওপর সমাধিসৌধ নির্মাণ করলেন তদানীন্তন ফরাসী সরকার।

নেপোলিয়নের অনুচর বা সহচরবৃন্দ যাঁরা তাঁর সাথে বিগত ছয় বৎসর যাবৎ সেণ্ট হেলেনায় কাটিয়েছেন, যাপন করেছেন এরকম বন্দীজীবন নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর তাঁরা সকলেই সেণ্ট হেলেনা ছেড়ে যে যাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন। নেপোলিয়নের সমাধিক্ষেত্র পাহারা দেবার জন্য ফ্রান্সের কোন লোক আর সেণ্ট হেলেনায় থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

সেণ্ট হেলেনার গভর্ণর হাডসন লো চলে এলেন ইংলণ্ডে। নেপোলিয়নের জেনারেল লাসকাসের ছেলে হাডসন লোকে নেপোলিয়নের ওপর বর্বরোচিত ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে লাসকাসের ছেলে গভর্ণর হাডসন লোকে লণ্ডনের রাস্তায় ঘোড়ার চাবুকের কষাঘাতে অর্দ্ধমৃত করেছিলেন। হাডসন লোকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। তারপর কতদিন হাডসন লো বেঁচে ছিলেন তা ঠিক জানা যায়নি। তবে কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। হয়ত ইংলণ্ডের খবরের কাগজ এবং সুধী সমাজের ধিক্কারের জন্যই তাঁকে এ পথ বেছে নিতে হয়েছিল। এবং এরপর কবে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য আজ অবধি পাওয়া যায় নি।

এভাবে ক্রোধে ঘৃণায় হাডসন লোর ওপর প্রতিশোধ নিলেন লাসকাসের ছেলে। নেপোলিয়নের ওপর বর্বরোচিত ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা পেলেন নরপশু হাডসন লো।

লণ্ডনের সমস্ত খবরের কাগজ নেপোলিয়নের ওপর ব্রিটিশ সরকারের বর্বরোচিত ব্যবহারের প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা লিভারপুল মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসলরীকে নেপোলিয়নের ওপর এ রকম বর্বরোচিত অত্যাচারের জন্য দায়ী করতে লাগলেন। এবং তাঁরা সকলেই দৃঢ় ভাষায় জানালেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসলরীর প্ররোচনায়

হাডসন লো লংউডের কারাগারে নেপোলিয়নকে নানান উপায়ে অত্যাচার করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

ক্যাসেলরী চারদিক থেকে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়ে দারুণ হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর মাত্র এক বৎসর ৩ মাস ক্যাসলরী জীবিত ছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ১২ আগষ্ট লণ্ডনে আত্মহত্যা করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এভাবে আত্মহনন করে ক্যাসেলরী ইংলণ্ডের সুধী সমাজের কটু সমালোচনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের ক্রোধের অবসান হল খানিকটা। নেপোলিয়নের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসেলরী ও নেপোলিয়নের ঘাতক হাডসন লো'র জীবনাবসান ঘটল।

ডঃ এণ্টিমার্কি রোমে ফিরে গেলেন। সকলেই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। এণ্টিমার্কি নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়ার কাছেও গেলেন। লেটিজিয়ার কাছে তিনি তিন দিন ছিলেন। নেপোলিয়নের ওপর সেণ্ট হেলেনায় হাডসন্ লো কিরূপ বর্বরোচিত ব্যবহার করেছেন এবং নেপোলিয়নকে তিল তিল করে কিভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এণ্টিমার্কি লেটিজিয়াকে।

লেটিজিয়া তাঁর বীরপুত্রের ওপর এরকম অত্যাচারের কাহিনী এণ্টিমার্কির কাছে শুনতে শুনতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

এরকম শোকে দুঃখে অসহায় লেটিজিয়া তখন রোমে ভাই কার্ডিন্যাল ফেচের প্রাসাদে কোন রকমে দিন যাপন করছেন। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর প্রায় ১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন লেটিজিয়া। এর মধ্যে কন্যা এলিজা এবং পলিন ও মারা গেছেন। শোকে লেটিজিয়া মৃত প্রায়। তাঁর বামদিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। চক্ষুদুটিও গেছে নষ্ট হয়ে। তবুও রোমে ভাইয়ের প্রাসাদে বীরপুত্র নেপোলিয়নের একটি প্রস্তর মূর্তির সামনে তিনি দিনের পর দিন বসে থাকতেন। অবশ্য তিনি ত আর চোখে বীরপুত্র নেপোলিয়নের

প্রস্তর মূর্ত্তি দেখতে পেতেন না। তবুও মনের সান্ত্বনা। মাতৃহৃদয়ের কষ্ট নিবারণ করার ক্ষমতা কারই বা আছে ?

এরকম অসহায় অবস্থায় থেকে লেটিজিয়া মৃত্যুর দিন গুণছেন। নেপোলিয়নের একমাত্র বৈধ সন্তান অর্থাৎ ল্যুইসার প্রথম পুত্র অস্ট্রিয়া থেকে সময় সময় ঠাকুরমার কাছে চিঠিপত্র দিতেন। তখন নেপোলিয়নের পুত্রের বয়স ২০/২১ হবে। লেটিজিয়া নাতিকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়া সরকার নেপোলিয়ন পুত্রকে তাঁর ঠাকুরমার কাছে যাবার অনুমতি দেননি। মেরিয়া ল্যুইসা তখন অন্য একজনকে বিয়ে করে সুখের ঘর বেঁধেছেন। নেপোলিয়নের মৃত্যুতে তিনি কতটা আঘাত পেয়েছিলেন সেটা সঠিক বলা মুস্কিল। তবে এ সময় মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ল্যুইসা ও নেপোলিয়নের প্রথম পুত্র হঠাৎ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এরকম অবস্থায় নাতির মৃত্যুসংবাদ লেটিজিয়াকে শোকে আচ্ছন্ন করে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন—ভগবানের কাছে তাঁর নিজের মৃত্যুর জন্য আকুল মিনতি জানানো ভিন্ন আর কোন পথ নেই। যে দিকেই তাকাচ্ছেন সে দিকেই যেন তাঁর অন্ধকার।

এভাবে অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় ১৫ বৎসর অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী কার্ডিন্যাল ফেচের প্রাসাদেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ক্যাথলিক ধর্মমতে রোমেই তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

নেপোলিয়নের জীবনী লেখক এমিল লুড্উইগ যথার্থই বলেছেন। "Napoleon's life is a great epic, written by the hand of fate; its full meaning will not reveal itself to one who gives rein to imagination but only to him who gives himself upto the amor fati".

সমাপ্ত

× × × × × × সংশোধনী × × × × × ×

পৃষ্ঠা	লাইন	ভ্রম	সংশোধন
৯	৯	সহজেয়	সহজেই
৯	১৭	পানিগ্রহণ	পাণিগ্রহণ
১০	১	ছিল	ছিলেন
১০	২	করতে চাইত না	করতে চাইতেন না
১০	১১	মহিমাময়	মহিমময়
১১	৮	সম্রাট (২৪৫খ্রীঃ-৩১৩খ্রী)	ডায়ক্লেশিয়নের (২৪৫খ্রী ৩১৩খ্রী)
১১	১৫	Nepoleon	Napoleon
১১	১৭	crownin	cronin
১১	২৩	সুকুমারবিত্তি	সুকুমারবৃত্তি
১২	২	ঐশ্বারিক	ঐশ্বরিক
১৪	১	নাপোলিয়নের	নেপোলিয়নের
১৬	৩	পেষা করার	পেষণ করার
১৬	৭	পারদর্শীতার	পারদর্শিতার
১৮	২৬	কৌলিণ্য	কৌলীন্য
২১	৯	কিংবন্দীতে	কিংবদন্তিতে
২৪	২৩	সদশ্য	সদস্য
৩১	৮	নেপোলিয়ন	নেপোলিয়নকে
৩১	৯	নিযুক্ত করলেন	নিযুক্ত করল
৩৭	২৫	ardonr	ardour
৪১	২৭	ঔজস্বিনী	ওজস্বিনী
৪২	১৩	অত্যাচারীত	অত্যাচারিত
৪২	২৭	সঙ্কিত	শঙ্কিত
৫৪	১৫	অধিষ্টিত	অধিষ্ঠিত
৫৫	৮	বলেছেন	একটি বলেছেন
৫৫	১৮	সেই সূত্রে সে	সেই সূত্রে সেই
৫৭	১৮	উচ্ছাকাখা	উচ্চাকাঙ্ক্ষা

পৃষ্ঠা	লাইন	ভ্রম	সংশোধন
৫৯	২২	মহত্ত্বের	মহত্ত্বের
৭২	৩	দুমুটো	দুমুঠো
৭৬	১৮	সপে	সঁপে
৭৭	৩	দেশেথ	দেশের
৮০	২১	আদর্শনে	অদর্শনে
৮২	১৭	ঘণিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠ
৯২	২১	নিবৃত্তি	নিবৃত্ত
৯৮	২২	ক্রিড়ণক	ক্রীড়নক
৯৮	২৪	আস্বস্ত	আশ্বস্ত
১০২	২০	যে এতদিন	যিনি এতদিন
১০৪	১৩	দৈর্ঘে মাত্র ১ মাইল	দৈর্ঘে মাত্র ১৬ মাইল
১০৬	৮	তাবর তাবর	তাবড় তাবড়
১১১	২	সে দুঃখিত, লজ্জিত	নে দুঃখিত, লজ্জিত
১১৯	৫	বৈপরিত্যের	বৈপরীত্যের
১২২	৫	নীতির	নাতির
১২৬	২	নিনি	তিনি
১৩০	৮	পারদর্শীতা	পারদর্শিতা
১৩৪	২২	দারিদ্যের	দারিদ্র্যের
১৪৫	৯	ওপর তা ও	ওপর তাঁর
১৫৪	২৭	আর্দিষ্ট	আদিষ্ট